আল আনফাল

৮

নাযিলের সময়-কাল

এ সূরাটি দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের পরে নাযিল হয়। ইসলাম ও কুফরের মধ্যে সংঘটিত এ প্রথম যুদ্ধের ওপর এতে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়েছে। সূরার মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে অনুমান করা যায়, সম্ভবত এ সমগ্র সূরাটি একটি মাত্র ভাষণের অন্তরভুক্ত এবং একই সংগে এ ভাষণটি নাযিল করা হয়। তবে এর কোন কোন আয়াত বদর যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পরে নাযিল হয়ে থাকতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে ভাষণের ধারবাহিকতায় এগুলোকে উপযুক্ত স্থানে রেখে এ সমগ্র ভাষণটিকে একটি ধারাবাহিক ভাষণের রূপ দান করা হয়েছে। কিন্তু দু'–তিনটি আলাদা আলাদা ভাষণকে এক সাথে জুড়ে দিয়ে একটি অখণ্ড ভাষণে রূপান্তরিত করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে এমন কোন জোড়ের সন্ধান এ সমগ্র ভাষণের কোথাও পাওয়া যাবে না।

ঐতিহাসিক পটভূমি

এ সূরাটি পর্যালোচনা করার আগে বদরের যুদ্ধ এবং তার সাথে সম্পর্কিত অবস্থা ও ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দাওয়াতের প্রথম দশ বারো বছর মক্কা মুয়ায্যমায় অবস্থান করেছিলেন। এ সময় তাঁর দাওয়াত যথেষ্ট পরিপক্কতা ও স্থিতিশীলতা অর্জন করেছিল। কারণ এর পেছনে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী দাওয়াতের পতাকাবাহী উন্নত চরিত্র ও বিশাল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী এক জ্ঞানী পুরুষ। তিনি নিজের ব্যক্তি সত্তার সমস্ত যোগ্যতা ও সামর্থ এ কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর কার্যধারা থেকে এ সত্যটি পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, এ আন্দোলনকে তার সাফল্যের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য তিনি দৃঢ়সংকল্প। এ লক্ষে উপনীত হবার জন্য পথের যাবতীয় বিপদ–আপদ ও সংকট–সমস্যার মোকাবিলায় তিনি সর্বক্ষণ প্রস্তুত। অন্যদিকে এ দাওয়াতের মধ্যে ছিল এমন এক অদ্ভূত ও তীব্র আকর্ষণী ক্ষমতা যে, হৃদয়–মস্তিষ্কের গভীরে তার অনুপ্রবেশ কার্য চলছিল দ্রুত ও অপ্রতিহত গতিতে। মূর্খতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার এবং হিংসা ও সংকীর্ণ স্বার্থপ্রীতির প্রাচীর তার পথ রোধ করতে পারছিল না। এ কারণে আরবের প্রাচীন জাহেলী ব্যবস্থার সমর্থক শ্রেণী প্রথম দিকে একে হালকাভাবে এবং অবজ্ঞার চোখে দেখলেও মক্কী যুগের শেষের দিকে একে একটি গুরুতর বিপদ বলে মনে করছিল। একে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা নিজেদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে চাচ্ছিল। কিন্তু তখনো পর্যন্ত এ দাওয়াতের মধ্যে কোন কোন দিক দিয়ে বেশ কিছুটা অভাব রয়ে গিয়েছিল।

এক ঃ তখনো একথা পুরোপুরি প্রমাণ হয়নি যে, এমন ধরনের যথেষ্ট সংখ্যক অনুসারী এ দাওয়াতের পতাকা তলে সমবেত হয়েছে যারা শুধু তার অনুগতই নয় বরং তার নীতিকে মনেপ্রাণে ভালও বাসে, তাকে বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে নিজেদের সর্বশক্তি ও সকল উপায়–উপকরণ ব্যয় করতে প্রস্তুত এবং এ জন্য নিজেদের সব কিছু কুরবানী করে দিতে, সারা দুনিয়ার সাথে লড়াই করতে, এমন কি নিজেদের প্রিয়তম আত্মীয়তার বাঁধনগুলো কেটে ফেলতেও উদগ্রীব। যদিও মক্কায় ইসলামের অনুসারীরা কুরাইশদের জুলুম–নির্যাতন বরদাশত করে নিজেদের ঈমানের অবিচলতা ও নিষ্ঠা এবং ইসলামের সাথে তাদের অটুট সম্পর্কের পক্ষে বেশ বড় আকারের প্রমাণ পেশ করেছিল, তবুও একথা প্রমাণিত হওয়া তখনো বাকী ছিল যে, ইসলামী আন্দোলন এমন একদল উৎসর্গীত প্রাণ অনুসারী পেয়ে গেছে যারা নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষের মোকাবিলায় অন্য কোন জিনিসকেই প্রিয়তর মনে করে না। বস্তুত একথা প্রমাণ করার জন্য তখনো অনেক পরীক্ষারও প্রয়োজন ছিল।

দুই ঃ এ দাওয়াতের আওয়াজ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়লেও এর প্রভাবগুলো ছিল চারদিকে বিক্ষিপ্ত ও অসংহত। এ দাওয়াত যে জনশক্তি সংগ্রহ করেছিল তা এলোমেলো অবস্থায় সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। পুরাতন জাহেলী ব্যবস্থার সাথে চূড়ান্ত মোকাবিলা করার জন্য যে ধরনের সামষ্টিক শক্তির প্রয়োজন ছিল তা সে তখনো অর্জন করেনি।

তিন ঃ এ দাওয়াত তখনো মাটিতে কোথাও শিকড় গাড়তে পারেনি। তখনো তা কেবল বাতাসেই উড়ে বেড়াচ্ছিল। দেশের অভ্যন্তরে এমন কোন এলাকা ছিল না যেখানে দৃঢ়পদ হয়ে নিজের ভূমিকাকে সুসংহত করে সে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারতো। তখনো পর্যন্ত যেখানেই যে মুসলমান ছিল, কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে তার অবস্থান ছিল ঠিক খালি পেটে গেলা কুইনিনের মত। অর্থাৎ খালি পেটে কুইনিন গিললে পেট তাকে বমি করে উগ্‌রে দেবার জন্য সর্বক্ষণ চাপ দিতে থাকে এবং কোথাও তাকে এক দণ্ড তিষ্টাতে দেয় না।

চার ঃ সে সময় পর্যন্ত এ দাওয়াত বাস্তব জীবনের কার্যাবলী নিজের হাতে পরিচালনা করার সুযোগ পায়নি। তখনো সে তার নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়নি। নিজস্ব অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা রচনাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অন্যান্য শক্তির সাথে তার যুদ্ধ ও সন্ধির কোন ঘটনাই ঘটেনি। তাই যেসব নৈতিক বিধানের ভিত্তিতে এ দাওয়াত সমগ্র দেশ ও সমাজকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করতে চাচ্ছিল তার কোন প্রদর্শনীও করা যায়নি। আর এ দাওয়াতের বাণীবাহক ও তাঁর অনুসারীরা যে জিনিসের দিকে সমগ্র দুনিয়াবাসীকে আহবান জানিয়ে আসছিলেন তাকে কার্যকর করার ব্যাপারে তারা নিজেরা কতটুকু নিষ্ঠাবান, এখনো কোন পরীক্ষার মানদণ্ডে যাচাই বাছাই করার পর তার সুস্পষ্ট চেহারাও সামনে আসেনি।

মক্কী যুগের শেষ তিন–চার বছরে ইয়াসরেবে ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে অপ্রতিহত গতিতে। সেখানকার লোকেরা আরবের অন্যান্য এলাকার গোত্রগুলোর তুলনায় অধিকতর সহজে ও নির্দ্বিধায় এ আলো গ্রহণ করতে থাকে। শেষে নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে হজ্জের সময় ৭৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল রাতের আঁধারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলো, তারা কেবল ইসলাম গ্রহণই করেননি

বরং তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদেরকে নিজেদের শহরে স্থান দেয়ারও আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এটি ছিল ইসলামের ইতিহাসের একটি বৈপ্লবিক পটপরিবর্তন। মহান আল্লাহ তাঁর নিজ অনুগ্রহে এ দুর্লভ সুযোগটি দিয়েছিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাত বাড়িয়ে তা লুফে নিয়েছিলেন। ইয়াসরেববাসীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধুমাত্র একজন শরণার্থী হিসেবে নয় বরং আল্লাহর প্রতিনিধি এবং নেতা ও শাসক হিসেবেও আহবান করছিলেন। আর তাঁর অনুসারীদেরকে তারা একটি অপরিচিত দেশে নিছক মুহাজির হিসেবে বসবাস করার জন্য আহবান জানাচ্ছিলেন না। বরং আরবের বিভিন্ন এলাকায় ও বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যেসব মুসলমান ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাদের সবাইকে ইয়াসরেবে জমা করে ইয়াসরেবী মুসলমানদের সাথে মিলে একটি সুসংবদ্ধ সমাজ গড়ে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। এভাবে মূলত ইয়াসরেব নিজেকে "মদীনাতুল ইসলাম" তথা ইসলামের নগর হিসেবে উপস্থাপিত করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আহবানে সাড়া দিয়ে সেখানে আরবের প্রথম দারুল ইসলাম গড়ে তুললেন।

এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের অর্থ কি হতে পারে সে সম্পর্কে মদীনাবাসীরা অনবহিত ছিল না। এর পরিষ্কার অর্থ ছিল, একটি ছোট্ট শহর সারাদেশের উদ্যত তরবারি এবং সমগ্র দেশবাসীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বয়কটের মোকাবিলায় নিজেকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। কাজেই আকাবার বাইআত গ্রহণ করার সময় সেদিনের সেই রাত্রিকালীন মজলিসে ইসলামের প্রাথমিক সাহায্যকারীরা (আনসারগণ) এ পরিণাম সম্পর্কে পুরোপুরি জেনে বুঝেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে নিজেদের হাত রেখেছিলেন। যখন এ বাইআত অনুষ্ঠিত হচ্ছিল ঠিক তখনই ইয়াসরেবী প্রতিনিধি দলের সর্বকনিষ্ঠ যুব সদস্য আস'আদ ইবনে যুরারাহ (রা) উঠে বললেন ঃ

رويدا يا اهل يثرب ! انالم نضرب اليه اكباد الابل الاونحن نعلم انه رسول الله ، وان اخراجه اليوم مناواة للعرب كافة ، وقتل خياركم ، وتعضكم السيوف – فاما انتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه واجره على الله ، واما انتم قوم تخافون من انفسكم خيفة فذروه فبينوا ذلك فهو اعذر لكم عند الله –

"থামো, হে ইয়াসরেব বাসীরা! আমরা একথা জেনে বুঝেই এঁর কাছে এসেছি যে, ইনি আল্লাহর রসূল এবং আজ এঁকে এখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে সমগ্র আরববাসীর শত্রুতার ঝুঁকি নেয়া। এর ফলে তোমাদের শিশু সন্তানদেরকে হত্যা করা হবে এবং তোমাদের ওপর তরবারি বর্ষিত হবে। কাজেই যদি তোমাদের এ আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা থাকে তাহলে এঁর দায়িত্ব গ্রহণ করো। আল্লাহ এর প্রতিদান দেবেন। আর যদি তোমরা নিজেদের প্রাণকে প্রিয়তর মনে করে থাকো তাহলে দায়িত্ব ছেড়ে দাও এবং পরিষ্কার ভাষায় নিজেদের অক্ষমতা জানিয়ে দাও। কারণ এ সময় অক্ষমতা প্রকাশ করা আল্লাহর কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হতে পারে।"

প্রতিনিধি দলের আর একজন সদস্য আব্বাস ইবনে উবাদাহ ইবনে নাদ্‌লাহ (রা) একথারই পুনরাবৃত্তি করেন এভাবে ঃ

اتعلمون علام تبايعون هذا الرجل ؟ (قالوا نعم ، قال) انكم تبايعونه على حرب الاحمر والاسود من الناس - فان كنتم ترون انكم اذا نهكت اموالكم مصيبة واشرافكم قتلا اسلمتموه فمن الان فدعوه ، فهو والله ان فعلتم خزى الدنيا والاخرة وان كنتم ترون انكم وافون له بما دعوتموه اليه على نهكة الاموال وقتل الاشراف فخذوه ، فهو والله خير الدنيا والاخرة -

"তোমরা কি জানো, এ ব্যক্তির হাতে কিসের বাইআত করছো? (ধ্বনি ঃ হাঁ আমরা জানি) তোমরা এঁর হাতে বাইআত করে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ঝুঁকি নিচ্ছো। কাজেই যদি তোমরা মনে করে থাকো, যখন তোমাদের ধন-সম্পদ ধ্বংসের মুখোমুখি হবে এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হবার আশংকা দেখা দেবে তখন তোমরা এঁকে শত্রুদের হাতে সোপর্দ করে দেবে, তাহলে আজই বরং এঁকে ত্যাগ করাই ভাল। কারণ আল্লাহর কসম, এটা দুনিয়ায় ও আখেরাতে সবখানেই লাঞ্ছনার কারণ হবে। আর যদি তোমরা মনে করে থাকো, এ ব্যক্তিকে তোমরা যে আহবান জানাচ্ছো, নিজেদের ধন-সম্পদ ধ্বংস ও নেতৃস্থানীয় লোকদের জীবন নাশ সত্ত্বেও তোমরা তা পালন করতে প্রস্তুত থাকবে, তাহলে অবশ্যি তাঁর হাত আঁকড়ে ধরো। কারণ আল্লাহর কসম, এরই মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ।"

একথায় প্রতিনিধি দলের সবাই এক বাক্যে বলে উঠলেন ঃ

فانا ناخذه على مصيبة الاموال وقتل الاشراف

"আমরা এঁকে গ্রহণ করে আমাদের ধন-সম্পদ ধ্বংস করতে ও নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হবার ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।"

এ ঘটনার পর সেই ঐতিহাসিক বাইআত অনুষ্ঠিত হয়। ইতিহাসে একে আকাবার দ্বিতীয় বাইআত বলা হয়।

অন্যদিকে মক্কাবাসীর কাছেও এ ঘটনাটির তাৎপর্য ছিল সুবিদিত। ইতিপূর্বে কুরাইশরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিপুল প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ যোগ্যতার সাথে পরিচিত হয়েছিল এবং এখন সেই মুহাম্মাদই (সা) যে, একটি আবাস লাভ করতে যাচ্ছিলেন, তা তারা বেশ অনুধাবন করতে পারছিল। তাঁর নেতৃত্বে ইসলামের অনুসারীরা যে একটি সুসংগঠিত দলের আকারে অচিরেই গড়ে উঠবে এবং সমবেত হবে একথাও তারা বুঝতে পারছিল। আর ইসলামের এ অনুসারীরা সংকল্পে কত দৃঢ়, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগে কত অবিচল, এতদিনে সেটা তাদের কাছে অনেকটা পরীক্ষিত হয়ে

গিয়েছিল। এহেন সত্যাভিসারী কাফেলার এ নব উত্থান পুরাতন ব্যবস্থার জন্য মৃত্যুর ঘন্টাস্বরূপ। তাছাড়া মদীনার মত জায়গায় এই মুসলিম শক্তির একত্র সমাবেশ কুরাইশদের জন্য আরো নতুন বিপদের সংকেত দিচ্ছিল। কারণ লোহিত সাগরের কিনারা ধরে ইয়ামন থেকে সিরিয়ার দিকে যে বাণিজ্য পথটি চলে গিয়েছিল তার সংরক্ষিত ও নিরাপদ থাকার ওপর কুরাইশ ও অন্যান্য বড় বড় গোত্রের অর্থনৈতিক জীবন নির্ভরশীল ছিল। আর এটি এখন মুসলমানদের প্রভাবাধীনে চলে যাওয়া প্রায় নিশ্চিত। এ প্রধান বাণিজ্য পথটি দখল করে মুসলমানরা জাহেলী ব্যবস্থার জীবন ধারণ দুর্বিসহ করে তুলতে পারতো। এ প্রধান বাণিজ্য পথের ভিত্তিতে শুধু মাত্র মক্কাবাসীদের যে ব্যবসায় চলতো তার পরিমাণ ছিল বছরে প্রায় আড়াই লাখ আশরফী। তায়েফ ও অন্যান্য স্থানের ব্যবসায় ছিল এর বাইরে।

কুরাইশরা এ পরিণতির কথা ভালভাবেই জানতো। যে রাতে আকাবার বাইআত অনুষ্ঠিত হলো সে রাতেই এ ঘটনার উড়ো খবর মক্কাবাসীদের কানে পৌঁছে গেলো। আর সাথে সাথেই সেখানে হৈ চৈ শুরু হয়ে গেলো। প্রথমে তারা চেষ্টা করলো মদীনাবাসীদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের দল থেকে ভাগিয়ে নিতে। তারপর যখন মুসলমানরা একজন দু'জন করে মদীনায় হিজরত করতে থাকলো এবং কুরাইশদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেলো যে, এখন মুহাম্মাদও (সা) সেখানে স্থানান্তরিত হয়ে যাবেন তখন তারা এ বিপদকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য সর্বশেষ উপায় অবলম্বনে এগিয়ে এলো। রসূলের (সা) হিজরতের মাত্র কয়েক দিন আগে কুরাইশদের পরামর্শ সভা বসলো। অনেক আলোচনা পর্যালোচনার পর সেখানে স্থির হলো, বনী হাশেম ছাড়া কুরাইশদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে লোক বাছাই করা হবে এবং এরা সবাই মিলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করবে। এর ফলে বনী হাশেমের জন্য এ সমস্ত গোত্রের সাথে একাকী লড়াই করা কঠিন হবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে তারা প্রতিশোধের পরিবর্তে রক্ত মূল্য গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানী এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আল্লাহর ওপর নির্ভরতা ও উন্নত কৌশল অবলম্বনের কারণে তাদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেলো। ফলে রসূলুল্লাহ (সা) নির্বিঘ্নে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। এভাবে হিজরত প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে কুরাইশরা মদীনার সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে (যাকে হিজরতের আগে মদীনাবাসীরা নিজেদের বাদশাহ বানাবার প্রস্তুতি নিয়েছিল এবং রসূলের মদীনায় পৌঁছে যাবার এবং আওস ও খাযরাজদের অধিকাংশের ইসলাম গ্রহণের ফলে যার বাড়া ভাতে ছাই পড়ে গিয়েছিল) পত্র লিখলো ঃ "তোমরা আমাদের লোককে তোমাদের ওখানে আশ্রয় দিয়েছো। আমরা এ মর্মে আল্লাহর কসম খেয়েছি, হয় তোমরা তার সাথে লড়বে বা তাকে সেখান থেকে বের করে দেবে। অন্যথায় আমরা সবাই মিলে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরক হত্যা ও মেয়েদেরকে বাঁদী বানাবো।" কুরাইশদের এ উস্কানির মুখে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কিছু দুষ্কর্ম করার চক্রান্ত এঁটেছিল। কিন্তু সময় মত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দুষ্কর্ম রুখে দিলেন। তারপর মদীনার প্রধান সা'দ ইবনে মু'আয উমরাহ করার জন্য মক্কা গেলেন। সেখানে হারম শরীফের দরজার ওপর আবু জেহেল তার সমালোচনা করে বললো ঃ

الا اراك تطوف بمكه امنا وقد او يتم الصباة وزعمتم انكم تنصرونهم وتعينونهم ؟ لولا انك مع ابى صفوان مارجعت الى اهلك سالما –

"তোমরা আমাদের ধর্মত্যাগীদেরকে আশ্রয় দেবে এবং তাদেরকে সাহায্য–সহযোগিতা দান করবে আর আমরা তোমাদেরকে অবাধে মক্কায় তাওয়াফ করতে দেবো ভেবেছ? যদি তুমি আবু সফওয়ান তথা উমাইয়াহ ইবনে খল্‌ফের মেহমান না হতে তাহলে তোমাকে এখান থেকে প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরে যেতে দিতাম না।"

সা'দ জবাবে বললেন ঃ

والله لئن منعتنى هذا لامنعنك ماهو اشد عليك منه طريقك على المدينة –

"আল্লাহর কসম, যদি তুমি আমাকে এ কাজে বাধা দাও তাহলে আমি তোমাকে এমন জিনিস থেকে রুখে দেবো, যা তোমার জন্য এর চাইতে অনেক বেশী মারাত্মক। অর্থাৎ মদীনা দিয়ে তোমাদের যাতায়াতের পথ বন্ধ করে দেবো।"

অর্থাৎ এভাবে মক্কাবাসীদের পক্ষ থেকে যেন একথা ঘোষণা করে দেয়া হলো যে, বায়তুল্লাহ যিয়ারত করার পথ মুসলমানদের জন্য বন্ধ। আর এর জবাবে মদীনাবাসীদের পক্ষ থেকে বলা হলো, সিরিয়ার সাথে বাণিজ্য করার পথ ইসলাম বিরোধীদের জন্য বিপদসংকুল।

আসলে সে সময় মুসলমানদের জন্য উল্লেখিত বাণিজ্য পথের ওপর নিজেদের কর্তৃত্ব মজবুত করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় ছিল না। কারণ এ পথের সাথে কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রগুলোর স্বার্থ বিজড়িত ছিল। ফলে এর ওপর মুসলমানদের কর্তৃত্ব বেশী মজবুত হলে তারা ইসলাম ও মুসলমানদের ব্যাপারে নিজেদের শত্রুতামূলক নীতি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হতে পারে বলে আশা করা যায়। কাজেই মদীনায় পৌছার সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদ্যজাত ইসলামী সমাজে প্রাথমিক নিয়ম–শৃংখলা বিধান ও মদীনার ইহুদী অধিবাসীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করার পর সর্বপ্রথম এ বাণিজ্য পথটির প্রতি নজর দিলেন। এ ব্যাপারে তিনি দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন।

প্রথমত মদীনা ও লোহিত সাগরের উপকূলের মধ্যবর্তীস্থলে এ বাণিজ্য পথের আশেপাশে যেসব গোত্রের বসতি ছিল তাদের সাথে তিনি আলাপ–আলোচনা শুরু করে দিলেন। এভাবে তাদেরকে সহযোগিতামূলক মৈত্রী অথবা কমপক্ষে নিরপেক্ষতার চুক্তিতে আবদ্ধ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ সফলতা লাভ করলেন। সর্বপ্রথম নিরপেক্ষতার চুক্তি অনুষ্ঠিত হলো সাগর তীরবর্তী পার্বত্য এলাকার জুহাইনা গোত্রের সাথে। এ গোত্রটির ভূমিকা এ এলাকায় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারপর প্রথম হিজরীর শেষের দিকে চুক্তি অনুষ্ঠিত হলো বনী যামূরার সাথে। এ গোত্রটির অবস্থান ছিল ইয়াম্বু ও যুল আশীরার সন্নিহিত স্থানে এটি ছিল প্রতিরক্ষামূলক সহযোগিতার চুক্তি। দ্বিতীয় হিজরীর মাঝামাঝি সময়ে বনী মুদলিজও এ চুক্তিতে শামিল হলো। কারণ এ গোত্রটি ছিল বনী

যাম্‌রার প্রতিবেশী ও বন্ধু গোত্র। এ ছাড়াও ইসলাম প্রচারের ফলে এ গোত্রগুলোতে ইসলামের সমর্থক ও অনুসারীদের একটি বিরাট গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত কুরাইশদের সওদাগরী কাফেলাগুলোকে ভীত–সন্ত্রস্ত করে তোলার জন্য বাণিজ্য পথের ওপর একের পর এক ছোট ছোট ঝটিকা বাহিনী পাঠাতে থাকলেন। কোন কোন ঝটিকা বাহিনীর সাথে তিনি নিজেও গেলেন। প্রথম বছর এ ধরনের ৪টি বাহিনী পাঠানো হলো। মাগাযী (যুদ্ধ ইতিহাস) গ্রন্থগুলো এগুলোকে সারীয়া হামযা, সারীয়া উবাইদা ইবনে হারেস, সারীয়া সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস ও গায্‌ওয়াতুল আবওয়া নামে অভিহিত করা হয়েছে।[১] দ্বিতীয় বছরের প্রথম দিকের মাসগুলোয় একই দিকে আরো দু'টি আক্রমণ চালানো হলো। মাগাযী গ্রন্থগুলোয় এ দু'টিকে গায্‌ওয়া বুওয়াত ও গায্‌ওয়া যুল আশীরা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সমস্ত অভিযানের দু'টি বৈশিষ্ট উল্লেখযোগ্য। এক, এ অভিযানগুলোয় কোন রক্তপাতের ঘটনা ঘটেনি এবং কোন কাফেলা লুন্ঠিতও হয়নি। এ থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এর মাধ্যমে কুরাইশদেরকে বাতাসের গতি কোন্‌ দিকে তা জানিয়ে দেয়াই ছিল আসল উদ্দেশ্য। দুই, এর মধ্য থেকে কোন একটি বাহিনীতেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার একটি লোককেও শামিল করেননি। মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদেরকেই তিনি এসব বাহিনীর অন্তরভুক্ত করেন। কারণ এর ফলে যদি সংঘর্ষ বাধে তাহলে তা যেন শুধু কুরাইশদের নিজেদের পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অন্য গোত্রগুলো যেন এর সাথে জড়িয়ে পড়ে এ আগুনকে চারদিকে ছড়িয়ে না দেয়। ওদিকে মক্কাবাসীরাও মদীনার দিকে লুটেরা বাহিনী পাঠাতে থাকে। তাদেরই একটি বাহিনী কুর্‌য ইবনে জাবের আল ফিহ্‌রীর নেতৃত্বে একেবারে মদীনার কাছাকাছি এলাকায় হামলা চালিয়ে মদীনাবাসীদের গৃহপালিত পশু লুট করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে কুরাইশরা এ সংঘর্ষের মধ্যে অন্যান্য গোত্রদেরকেও জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। তাছাড়া তারা কেবল ভয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছিলো না, লুটতরাজও শুরু করে দিয়েছিল।

এ অবস্থায় ২য় হিজরীর শাবান মাসে (৬২৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী বা মার্চ মাস) কুরাইশদের একটি বিরাট বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া থেকে মক্কার পথে অগ্রসর হয়ে এমন এক জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল যে জায়গাটি ছিল মদীনাবাসীদের আওতার মধ্যে। এ কাফেলার সাথে ছিল প্রায় ৫০ হাজার আশরফীর সামগ্রী। তাদের সাথে তিরিশ চল্লিশ জনের বেশী রক্ষী ছিল না। যেহেতু পণ্যসামগ্রী ছিল বেশী এবং রক্ষীর সংখ্যা ছিল কম আর আগের অবস্থার কারণে মুসলমানদের কোন শক্তিশালী দলের তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করার আশংকা ছিল অত্যন্ত প্রবল, তাই কাফেলা সরদার আবু সুফিয়ান এ বিপদ সংকুল স্থানে পৌঁছেই সাহায্য আনার জন্য এক ব্যক্তিকে মক্কা অভিমুখে পাঠিয়ে দিল। লোকটি মক্কায় পৌঁছেই প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী নিজের উটের কান কেটে ফেললো, তার নাক চিরে দিল, উটের পিঠের আসন উল্টে দিলে এবং নিজের জামা সামনের দিকে ও পিছনের দিকে ছিঁড়ে ফেলে এই বলে চিৎকার করতে থাকলো ঃ

১. ইসলামের ইতিহাসের পরিভাষায় "সারীয়া" বলা হয় এমন ধরনের ছোটখাট বাহিনীকে যাকে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সালাম কোন সাহাবীর নেতৃত্বে পাঠিয়ে ছিলেন আর যে বাহিনীতে তিনি নিজে গিয়েছিলেন তাকে বলা হয় গায্‌ওয়া।

কোরাইশদের বাণিজ্যিক পথ
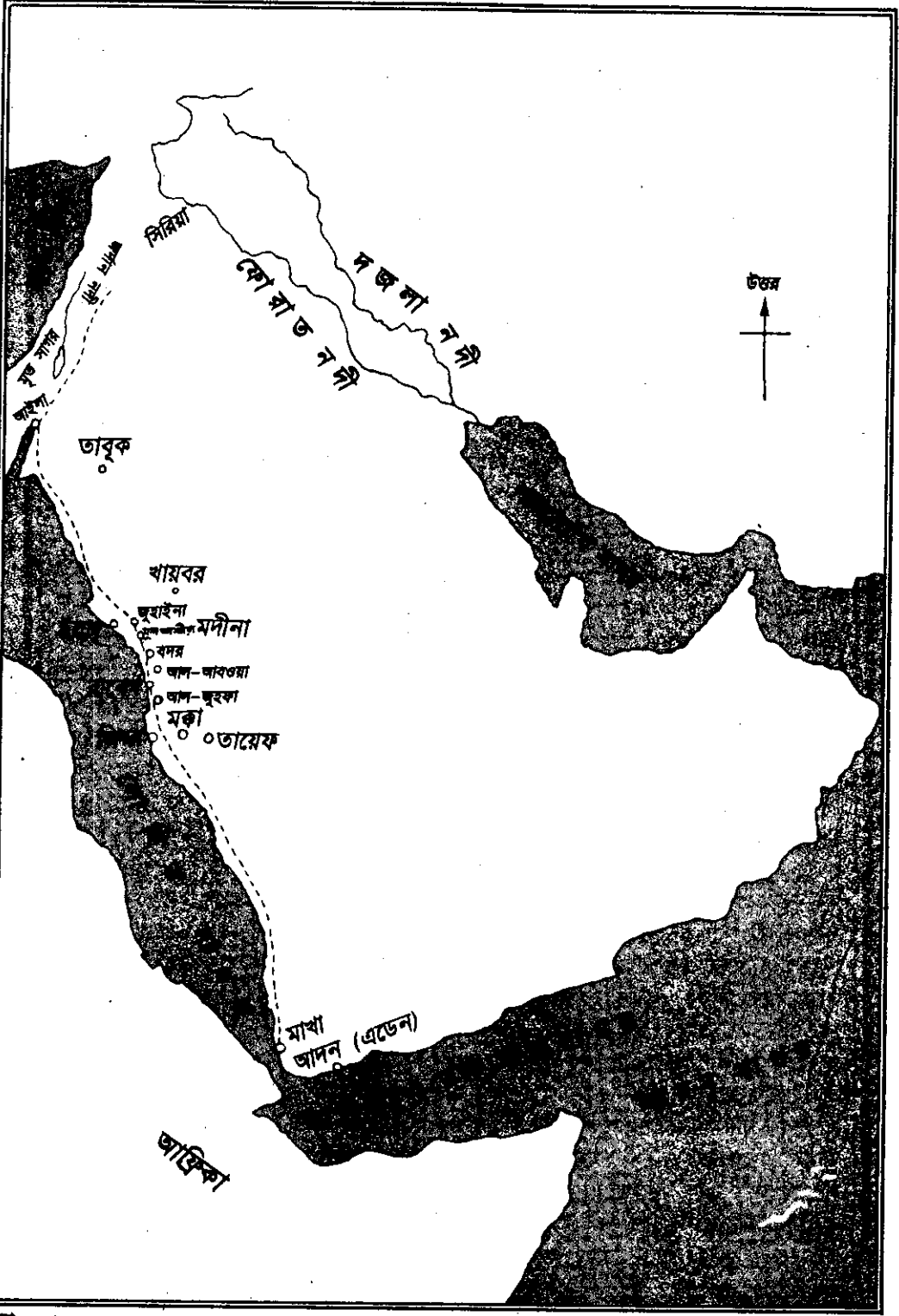
يا معشر قريش اللطيمه اللطيمه ، اموالكم مع ابى سفيان قد عرض لها محمد فى اصحابه ، لا ارى ان تدركوها ، الغوث ، الغوث ،

"হে কুরাইশরা! তোমাদের বাণিজ্য কাফেলার খবর শোনো। আবু সুফিয়ানের সাথে তোমাদের যে সম্পদ আছে, মুহাম্মাদ তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে তার পেছনে ধাওয়া করেছে। তোমাদের তা পাবার আশা নেই। সাহায্যের জন্য দৌড়ে চলো! সাহায্যের জন্য দৌড়ে চলো।!"

এ ঘোষণা শুনে সারা মক্কায় বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে গেলো। কুরাইশদের বড় বড় সরদাররা সবাই যুদ্ধের জন্য তৈরী হলো। প্রায় এক হাজার যোদ্ধা রণসাজে সজ্জিত হয়ে পূর্ণ আড়ম্বর ও জাঁক–জমকের সাথে যুদ্ধ ক্ষেত্রে রওয়ানা হলো। তাদের মধ্যে ছিল ৬শ বর্মধারী এবং একশ' জন অশ্বারোহী। নিজেদের কাফেলাকে শুধু নিরাপদে মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে আসাই তাদের কাজ ছিল না বরং এই সংগে তারা নিত্য দিনের এ আশংকা ও আতংকবোধকে চিরতরে খতম করে দিতে চাচ্ছিল। মদীনায় এ বিরোধী শক্তির নতুন সংযোজনকে তারা গুঁড়িয়ে দিতে এবং এর আশপাশের গোত্রগুলোকে এত দূর সন্ত্রস্ত করে তুলতে চাচ্ছিল যার ফলে ভবিষ্যতে এ বাণিজ্য পথটি তাদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ হয়ে যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলমান ঘটনাবলীর প্রতি সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অনুভব করলেন যেন চূড়ান্ত মীমাংসার সময় এসে গেছে। তিনি ভাবলেন এ সময় যদি একটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয় তাহলে ইসলামী আন্দোলন চিরকালের জন্য নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। বরং এরপর এ আন্দোলনের জন্য হয়তো আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার আর কোন সুযোগই থাকবে না। মক্কা থেকে হিজরত করে এ নতুন শহরে আসার পর এখনো দু'টি বছরও পার হয়ে যায়নি। মুহাজিররা বিত্ত ও সরঞ্জামহীন, আনসাররা অনভিজ্ঞ, ইহুদিগোত্রগুলো বিরুদ্ধবাদিতায় মুখর খোদ মদীনাতেই মুনাফিক ও মুশরিকদের একটি বিরাট গোষ্ঠী উপস্থিত এবং চারপাশের সমস্ত গোত্র কুরাইশদের ভয়ে ভীত। আর সেই সংগে ধর্মীয় দিক দিয়েও তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল। এ অবস্থায় যদি কুরাইশরা মদীনা আক্রমণ করে তাহলে মুসলমানদের এ ক্ষুদ্র দলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি তারা মদীনা আক্রমণ না করে শুধু মাত্র নিজেদের শক্তি প্রয়োগ করে বাণিজ্য কাফেলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং মুসলমানরা দমে গিয়ে ঘরের কোণে হাত–পা গুটিয়ে বসে থাকে তাহলেও সহসাই মুসলমানদের প্রতিপত্তি এমনভাবে আহত হবে এবং তাদের প্রভাব এত বেশী ক্ষুণ্ন হবে যার ফলে আরবের প্রতিটি শিশুও তাদের বিরুদ্ধে দুঃসাহসী হয়ে উঠবে। সারাদেশে তাদের কোন আশ্রয় স্থল থাকবে না। তখন চারপাশের সমস্ত গোত্র কুরাইশদের ইংগিতে কাজ করতে থাকবে। মদীনার ইহুদী, মুনাফিক ও মুশরিকরা প্রকাশ্যে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। মদীনায় জীবন–ধারণ করাও সে সময় দুসাধ্য হয়ে পড়বে। মুসলমানদের কোন প্রভাব–প্রতিপত্তি থাকবে না। ফলে তাদের ধন–প্রাণ–ইজ্জত–আবরুর ওপর আক্রমণ চালাতে কেউ ইতস্তত করবে না। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৃঢ় সংকল্প নিলেন যে, বর্তমানে যতটুকু শক্তি–সামর্থ আমাদের আছে তাই নিয়েই আমরা বের হয়ে পড়বো।

দুনিয়ার বুকে বেঁচে থাকার ও টিকে থাকার ক্ষমতা কার আছে এবং কার নেই ময়দানেই তার ফায়সালা হয়ে যাবে।

এ চূড়ান্ত পদক্ষেপ নেবার সংকল্প করেই তিনি আনসার ও মোহাজিরদের একত্র করলেন। তাদের সামনে পরিস্থিতি পরিষ্কার করে তুলে ধরলেন। একদিকে উত্তরে বাণিজ্য কাফেলা এবং অন্যদিকে দক্ষিণে এগিয়ে আসছে কুরাইশদের সেনাদল। আল্লাহর ওয়াদা, এ দু'টির মধ্য থেকে কোন একটি তোমরা পেয়ে যাবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ বলো, এর মধ্য থেকে কার মোকাবিলায় তোমরা এগিয়ে যেতে চাও? জবাবে বিপুল সংখ্যক সাহাবী মত প্রকাশ করলেন, কাফেলার ওপর আক্রমণ চালানো হোক। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে ছিল অন্য কিছু অভিপ্রায়। তাই তিনি নিজের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলেন। একথায় মোহাজিরদের মধ্য থেকে মিকদাদ ইবনে আমর (রা) উঠে বলেলেন ঃ

মদীনা থেকে বদর পর্যন্ত
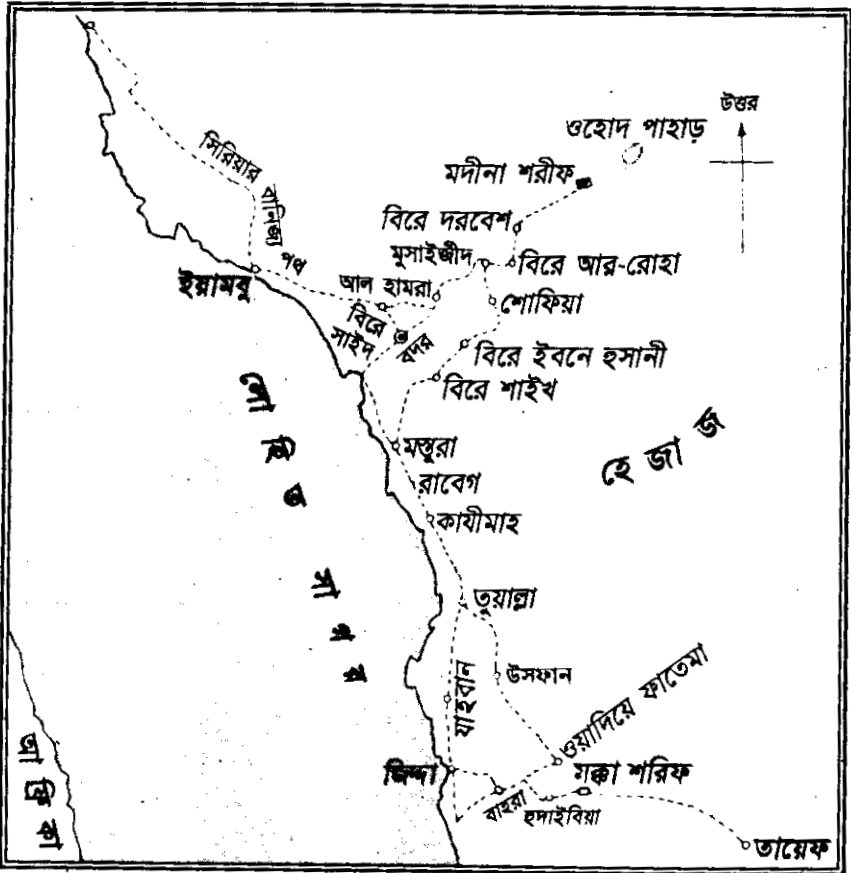
উপরোক্ত মানচিত্র কাফেলাদের মক্কা এবং মদীনা থেকে বদর পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তা প্রদর্শিত হইল।

يا رسول الله ! امض لما امرك الله ، فانا معك حيثما احببت ،
لا نقول لك كما قال بنوا اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا
ههنا قاعدون ، ولكن اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون
مادامت عين منا تطرف –

"হে আল্লাহর রসূল! আপনার রব আপনাকে যেদিকে যাবার হুকুম দিচ্ছেন সেদিকে চলুন। আপনি যেদিকে যাবেন আমরা আপনার সাথে আছি। আমরা বনী ইসরাঈলের মত একথা বলবো না : যাও, তুমি ও তোমার আল্লাহ দু'জনে লড়াই করো, আমরা তো এখানেই বসে রইলাম। বরং আমরা বলছি : চলুন আপনি ও আপনার আল্লাহ দু'জনে লড়ুন আর আমরাও আপনাদের সাথে জানপ্রাণ দিয়ে লড়াই করবো। যতক্ষণ আমাদের একটি চোখের তারাও নড়াচড়া করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত।"

কিন্তু আনসারদের মতামত না জেনে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। কারণ এ পর্যন্ত যেসব সামরিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল তাতে তাদের সাহায্য গ্রহণ করা হয়নি এবং প্রথম দিন তারা ইসলামকে সমর্থন করার যে শপথ নিয়েছিল তাকে কার্যকর করতে তারা কতটুকু প্রস্তুত তা পরীক্ষা করার এটি ছিল প্রথম সুযোগ। সুতরাং রসূলুল্লাহ (সা) সরাসরি তাদেরকে সম্বোধন না করে নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। একথায় সা'দ ইবনে মু'আয উঠে বললেন, সম্ভবত আপনি আমাদের সম্বোধন করে বলছেন? জবাব দিলেন : হাঁ। একথা শুনে সা'দ বললেন :

لقد امنا بك وصدقناك وشهدنا ان ماجئت به هوا الحق واعطيناك
عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة – فامض يارسول الله لما
اردت فوالذى بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته
لخضناه معك وما تخلف منا رجل واحد – ومانكره ان تلقى بنا
عدونا غدا انا لنصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله يريك
منا ماتقربه عينك فسربنا على بركة الله –

"আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি। আপনি যা কিছু এনেছেন তাকে সত্য বলে ঘোষণা করেছি। আপনার কথা শুনার ও আপনার আনুগত্য করার দৃঢ় শপথ নিয়েছি। কাজেই হে আল্লাহর রসূল! আপনি যা সংকল্প করেছেন তা করে ফেলুন। সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, আপনি যদি আমাদের নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন তাহলে আমরাও আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের একজনও পিছনে পড়ে থাকবে না। আপনি কালই আমাদের দুশমনের সাথে যুদ্ধ শুরু করুন। এটা আমাদের কাছে মোটেই অপছন্দনীয় নয়। আমরা যুদ্ধে অবিচল ও দৃঢ়পদ থাকবো।

মোকাবিলায় আমরা সত্যিকার প্রাণ উৎসর্গীতার প্রমাণ দেবো। সম্ভবত আল্লাহ আমাদের থেকে আপনাকে এমন কিছু কৃতিত্ব দেখিয়ে দেবেন, যাতে আপনার চোখ শীতল হবে। কাজেই আল্লাহর বরকতের ভরসায় আপনি আমাদের নিয়ে চলুন।"

এ আলোচনা ও বক্তৃতার পরে সিদ্ধান্ত হলো, বাণিজ্য কাফেলার পরিবর্তে কুরাইশ সেনা দলের মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু এটা কোন যেনতেন সিদ্ধান্ত ছিল না। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে যারা যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলেন, তাদের সংখ্যা ছিল তিনশ'র কিছু বেশী (৮৬ জন মোহাজির, ৬১ জন আওস গোত্রের এবং ১৭০ জন খাযরাজ গোত্রের)। এদের মধ্যে মাত্র দু'তিন জনের কাছে ঘোড়া ছিল। আর বাকি লোকদের জন্য ৭০ টির বেশী উট ছিল না। এগুলোর পিঠে তারা তিন চারজন করে পালাক্রমে সওয়ার হচ্ছিলেন। যুদ্ধাস্ত্রও ছিল একেবারেই অপ্রতুল। মাত্র ৬০ জনের কাছে বর্ম ছিল। এ কারণে গুটিকয় উৎসর্গীত প্রাণ মুজাহিদ ছাড়া এ ভয়ংকর অভিযানে শরীক অধিকাংশ মুজাহিদই হৃদয়ে উৎকণ্ঠা অনুভব করছিলেন। তারা মনে করছিলেন, যেন তারা জেনে বুঝে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিছু সুবিধাবাদী ধরনের লোক ইসলামের পরিসরে প্রবেশ করলেও তারা এমন ইসলামের প্রবক্তা ছিল না যাতে ধন–প্রাণের সংশয় দেখা দেয়। তারা এ অভিযানকে নিছক পাগলামী বলে অভিহিত করছিল। তারা মনে করছিল, ধর্মীয় আবেগ উচ্ছ্বাস এ লোকগুলোকে পাগলে পরিণত করেছে। কিন্তু নবী ও সাচ্চা–সত্যনিষ্ঠ মুমিনগণ একথা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, এটিই প্রাণ উৎসর্গ করার সময়। তাই আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাঁরা বের হয়ে পড়েছিলেন। তারা সোজা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেলেন। এই পথেই কুরাইশদের বাহিনী মক্কা থেকে ধেয়ে আসছিল। অথচ শুরুতে যদি বাণিজ্য কাফেলা লুট করার ইচ্ছা থাকতো তাহলে উত্তর পশ্চিমের পথে এগিয়ে যাওয়া হতো।[১]

রমযান মাসের ১৭ তারিখে বদর নামক স্থানে উভয় পক্ষের মোকাবিলা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখলেন, তিনজন কাফেরের মোকাবিলায় একজন মুসলমান দাঁড়িয়েছে এবং তাও আবার তারা পুরোপুরি অস্ত্র সজ্জিত নয়। এ অবস্থা দেখে তিনি আল্লাহর সামনে দোয়া করার জন্য দু' হাত বাড়িয়ে দিলেন। অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে ও কান্না বিজড়িত স্বরে তিনি দোয়া করতে থাকলেন ঃ

اللهم هذه قريش قد اتت بخيلائها تحاول ان تكذب رسولك ، اللهم

فنصرك الذى وعدتنى ، اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد –

১. উল্লেখ্য, বদরের যুদ্ধের ব্যাপারে ইতিহাস ও সীরাত লেখকরা যুদ্ধ কাহিনী সংক্রান্ত হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থগুলোয় উদ্ধৃত বর্ণনাসমূহের ওপর নির্ভর করেছেন। কিন্তু এই বর্ণনাগুলোর বিরাট অংশ কুরআন বিরোধী ও অনির্ভরযোগ্য। শুধুমাত্র ঈমানের কারণেই আমরা বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত কুরআনী বর্ণনাকে সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতে বাধ্য হই না বরং ঐতিহাসিক দিক দিয়েও যদি আজ এ যুদ্ধ সংক্রান্ত সবচাইতে নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এ সূরা আনফাল। কারণ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এটি নাযিল হয়েছিল। যুদ্ধে যারা শরীক ছিলেন এবং যুদ্ধের স্বপক্ষের বিপক্ষের সবাই এটি শুনেছিলেন ও পড়েছিলেন। 'নাউযুবিল্লাহ' এর মধ্যে কোন একটি কথাও যদি সত্য ও বাস্তব ঘটনা বিরোধী হতো তাহলে হাজার হাজার লোক এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতো।

"হে আল্লাহ! এই যে কুরাইশরা এসেছে, তাদের সকল ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা নিয়ে তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করতে। হে আল্লাহ! এখন তোমার সেই সাহায্য এসে যাওয়া দরকার, যার ওয়াদা তুমি করেছিলে আমার সাথে। হে আল্লাহ! যদি আজ এ মুষ্টিমেয় দলটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে এ পৃথিবীতে আর কোথাও তোমার ইবাদাত করার মত কেউ থাকবে না।"

এ যুদ্ধের ময়দানে মক্কার মোহাজিরদের পরীক্ষা ছিল সবচেয়ে কঠিন। তাদের আপন ভাই-চাচা ইত্যাদি তাদের বিরুদ্ধে ময়দানে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারোর বাপ, কারোর ছেলে, কারোর চাচা, কারোর মামা, কারোর ভাই দাঁড়িয়েছিল তার প্রতিপক্ষে। এ যুদ্ধে নিজের কলিজার টুকরার ওপর তরবারি চালাতে হচ্ছিল তাদের। এ ধরনের কঠিন পরীক্ষায় একমাত্র তারাই উত্তীর্ণ হতে পারে যারা পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারে হক ও সত্যের সাথে সম্পর্ক জুড়েছে এবং মিথ্যা ও বাতিলের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করতে পুরোপুরি উদ্যোগী হয়েছে। ওদিকে আনসারদের পরীক্ষাও কিছু কম ছিল না। এতদিন তারা মুসলমানদেরকে শুধুমাত্র আশ্রয় দিয়ে কুরাইশ ও তাদের সহযোগী গোত্রগুলোর শত্রুতার ঝুঁকি নিয়েছিল। কিন্তু এবার তো তারা ইসলামের সমর্থনে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাচ্ছিল। এর মানে ছিল, কয়েক হাজার লোকের একটি জনবসতি সমগ্র আরব দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে গেছে। এ ধরনের দুঃসাহস একমাত্র তারাই করতে পারে যারা সত্য আদর্শের ওপর ঈমান এনে তার জন্য নিজের
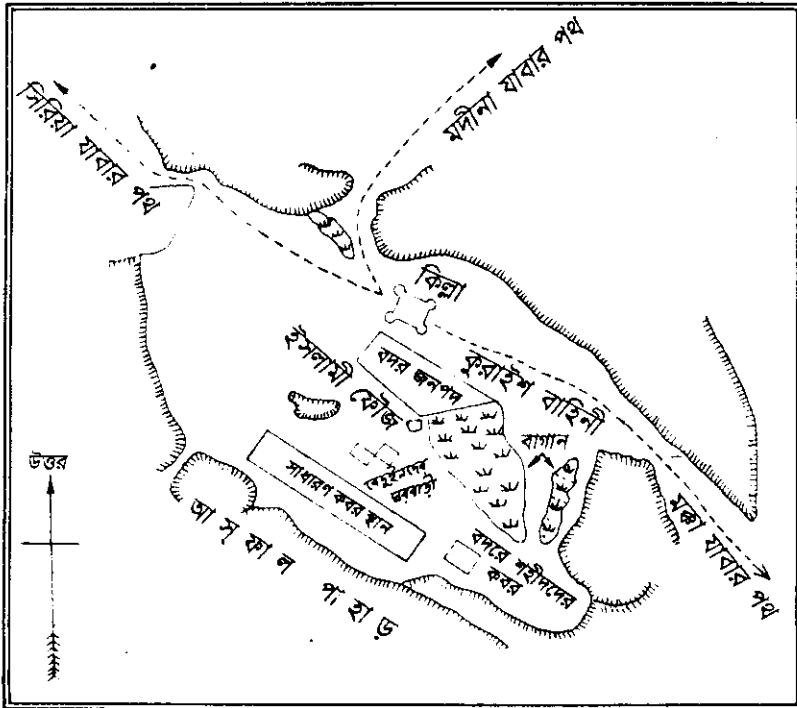
বদর যুদ্ধের মানচিত্র

ব্যক্তিগত স্বার্থকে পুরোপুরি জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত হতে পারে। অবশেষে তাদের অবিচল ঈমান ও সত্যনিষ্ঠা আল্লাহর সাহায্যের পুরস্কার লাভে সফল হয়ে গেলো। আর নিজেদের সমস্ত অহংকার ও শক্তির অহমিকা সত্ত্বেও কুরাইশরা এ সহায় সম্বলহীন জানবাজ সৈনিকদের হাতে পরাজিত হয়ে গেলো। তাদের ৭০ জন নিহত হলো, ৭০ জন বন্দী হলো এবং তাদের সাজসরঞ্জামগুলো গনীমাতের সামগ্রী হিসেবে মুসলমানদের দখলে এলো। কুরাইশদের যেসব বড় বড় সরদার তাদের মজলিস গুলজার করে বেড়াতো এবং ইসলাম বিরোধী আন্দোলনে যারা সর্বক্ষণ তৎপর থাকতো তারা এ যুদ্ধে নিহত হলো। এ চূড়ান্ত বিজয় আরবে ইসলামকে একটি উল্লেখযোগ্য শক্তিতে পরিণত করলো। একজন পাশ্চাত্য গবেষক লিখেছেন, "বদর যুদ্ধের আগে ইসলাম ছিল শুধুমাত্র একটি ধর্ম ও রাষ্ট্র। কিন্তু বদর যুদ্ধের পরে তা রাষ্ট্রীয় ধর্মে বরং নিজেই রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে গেলো।"

আলোচ্য বিষয়

কুরআনের এ সূরাটিতে এ ঐতিহাসিক যুদ্ধের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করা হয়েছে। কিন্তু দুনিয়ার রাজা বাদশাহরা যুদ্ধ জয়ের পর যেভাবে নিজেদের সেনাবাহিনীর পর্যালোচনা করে থাকেন এ পর্যালোচনার ধারাটি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

মুসলমানরা যাতে তাদের নৈতিক ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে, সে উদ্দেশ্যে এখানে সর্বপ্রথম সে সব নৈতিক ত্রুটি নির্দেশ করা হয়েছে। যেগুলো তখনো পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে বিরাজমান ছিল। তারপর তাদের জানানো হয়েছে, এ বিজয়ে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন কি পরিমাণ ছিল। এর ফলে তারা নিজেদের সাহসিকতা ও শৌর্য–বীর্যের মিথ্যা গরীমায় স্ফীত না হয়ে বরং এ থেকে আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা এবং আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

এরপর যে নৈতিক উদ্দেশ্যে মুসলমানদের হক ও বাতিলের এ সংঘাত সৃষ্টি করতে হবে তা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এই সংগে এ সংঘাতে যেসব নৈতিক গুণের সাহায্যে তারা সাফল্য লাভ করতে পারে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তারপর মুনাফিক, মুশরিক ও ইহুদিদের এবং এ যুদ্ধে বন্দী অবস্থায় আনীত লোকদের সম্বোধন করে অত্যন্ত শিক্ষণীয় বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে।

অতপর যুদ্ধের ফলে যেসব সম্পদ দখলে এসেছিল সেগুলো সম্পর্কে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেগুলোকে যেন তারা নিজেদের নয় বরং আল্লাহর সম্পদ মনে করে আল্লাহ তার মধ্য থেকে তাদের জন্য যতটুকু অংশ নির্ধারিত করেছেন ঠিক ততটুকুই যেন তারা কৃতজ্ঞতা সহকারে গ্রহণ করে নেয় এবং আল্লাহ নিজের কাজের জন্য এবং নিজের গরীব বান্দাদের সাহায্য করার জন্য যতটুকু অংশ নির্দিষ্ট করেছেন সন্তোষ ও আগ্রহ সহকারে যেন তা মেনে নেয়।

এরপর যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে কতিপয় নৈতিক বিধান দেয়া হয়েছে। ইসলামী দাওয়াতের এ পর্যায়ে এগুলো ছিল একান্ত জরুরী। এর মাধ্যমে নিজেদের যুদ্ধ বিগ্রহ ও সন্ধির ক্ষেত্রে মুসলমানরা জাহেলী পদ্ধতি থেকে দূরে থাকতে পারবে এবং দুনিয়ার ওপর তাদের নৈতিক

শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সংগে সারা দুনিয়াবাসী একথা জানতে সক্ষম হবে যে, ইসলাম তার আবির্ভাবের প্রথম দিন থেকেই নৈতিকতার ওপর বাস্তব জীবনের ভিত্ কায়েম করার যে দাওয়াত দিয়ে আসছে তার নিজের বাস্তব জীবনেই সে যথার্থই তা কার্যকর করেছে।

সবশেষে ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইনের কতিপয় ধারা বর্ণনা করা হয়েছে এতে দারুল ইসলামের মুসলমান অধিবাসীদের আইনগত মর্যাদা দারুল ইসলামের সীমানার বাইরে অবস্থানকারী মুসলমানদের থেকে আলাদা করে দেয়া হয়েছে।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ؕ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۪ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ① اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ② الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ③ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ؕ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ ④

লোকেরা তোমার কাছে গনীমাতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে? বলে দাও, "এ গনীমাতের মাল তো আল্লাহ ও তাঁর রসূলের। কাজেই তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।[১] *সাচ্চা ঈমানদার তো তারাই আল্লাহকে স্মরণ করা হলে যাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে। আর আল্লাহর আয়াত যখন তাদের সামনে পড়া হয়, তাদের ঈমান বেড়ে যায়*[২] *এবং তারা নিজেদের রবের ওপর ভরসা করে। তারা নামায কায়েম করে এবং যা কিছু আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে (আমার পথে) খরচ করে। এ ধরনের লোকেরাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য তাদের রবের কাছে রয়েছে বিরাট মর্যাদা, ভুলত্রুটির ক্ষমা*[৩] *ও উত্তম রিযিক।*

১. এক অদ্ভুত ধরনের ভূমিকা দিয়ে যুদ্ধের ঘটনাবলীর পর্যালোচনা শুরু করা হয়েছে। বদরের ময়দানে কুরাইশ সেনাদলের কাছ থেকে যে গনীমাতের মাল লাভ করা হয়েছিল তা বন্টন করার ব্যাপারে মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিয়েছিল। যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করার পর এই প্রথমবার তাঁরা ইসলামের পতাকা তলে লড়াই করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তাই এ প্রসংগে যুদ্ধ ও যুদ্ধজনিত বিষয়াদিতে ইসলামের বিধান কি তা তাদের জানা ছিল না। সূরা বাকারাহ ও সূরা মুহাম্মাদে কিছু প্রাথমিক নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তখনো কোন সামরিক কৃষ্টি, সভ্যতা ও রীতিনীতির ভিত্তি পত্তন করা হয়নি। আরো বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের ন্যায় মুসলমানরা তখনো পর্যন্ত যুদ্ধের ব্যাপারেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরাতন জাহেলিয়াতের ধারণাই পোষণ করতো। এ কারণে বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পরাজয়ের পর যে ব্যক্তি যে পরিমাণ গনীমাতের মাল হস্তগত করেছিল আরবের পুরাতন রীতি অনুযায়ী সে নিজেকে তার মালিক ভেবে নিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় একটি দল গনীমাতের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কাফেরদের পিছনে ধাওয়া করেছিল। তারা এ সম্পদে নিজেদের সমান সমান অংশ দাবী করলো। কারণ তারা বললো, আমরা যদি শত্রুর পেছনে ধাওয়া করে তাদেরকে দূরে ভাগিয়ে দিয়ে না আসতাম এবং তোমাদের মত গনীমাতের মাল আহরণ করতে লেগে যেতাম তাহলে শত্রুদের ফিরে এসে পাল্টা হামলা চালিয়ে আমাদের বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করে দেবারও সম্ভাবনা ছিল। তৃতীয় একটি দল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আইলাইহি ওয়া সাল্লামের হেফাজতে নিয়োজিত ছিল। তারাও নিজেদের দাবী পেশ করলো। তারা বললো, এ যুদ্ধে আমরাই তো সবচেয়ে বেশী মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছি। আমরা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারদিকে মজবুত প্রাচীর গড়ে না তুলতাম এবং আল্লাহ না করুন! তাঁর ওপর যদি কোন আঘাত আসতো তাহলে বিজয় লাভ করারই কোন প্রশ্ন উঠতো না। ফলে কোন গনীমাতের মালও লাভ করা যেতো না এবং বন্টন করারও সমস্যা দেখা দিতো না। কিন্তু গনীমাতের মাল কার্যত যাদের হাতে ছিল তাদের মালিকানার জন্য যেন কোন প্রমাণের প্রয়োজন ছিল না। একটি জ্বলজ্যান্ত সত্য যুক্তি–প্রমাণের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যাবে, যুক্তি–প্রমাণের এ অধিকার মানতে তারা প্রস্তুত ছিল না। এভাবে অবশেষে এ বিবাদ তিক্ততার রূপ ধারণ করলো এবং কথাবার্তার তিক্ততা এক পর্যায়ে মনেও ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

মহান আল্লাহ সূরা আনফাল নাযিল করার জন্য এ মনস্তাত্বিক পরিবেশ বেছে নিয়েছেন। এ বিষয় দিয়ে যুদ্ধ সংক্রান্ত নিজের পর্যালোচনামূলক বক্তব্যের সূচনা করেছেন। প্রথম বাক্যটির মধ্যেই প্রশ্নের জবাব নিহিত ছিল। বলেছেন ঃ "তোমার কাছে গনীমাতের মাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে?" মূল বক্তব্যে গনীমাতের মালকে "আনফাল" বলা হয়েছে। এ "আনফাল" শব্দের মধ্যে মূল সমস্যার সমাধান নিহিত রয়ে গেছে। আনফাল বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে "নফল"। আরবী ভাষায় ওয়াজিব অথবা যথার্থ অধিকার ও মূল পাওনার অতিরিক্তকে নফল বলা হয়। এ ধরনের নফল যদি কোন অধীনের পক্ষ থেকে হয় তাহলে তার অর্থ হয়, গোলাম নিজের প্রভুর জন্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের চাইতে বাড়তি কিছু কাজ করেছে। আর যখন তা মালিক বা কর্তার পক্ষ থেকে হয় তখন তার অর্থ হয়, এমন ধরনের দান বা পুরস্কার যা প্রভুর পক্ষ থেকে বান্দা বা গোলামকে তার যথার্থ পাওনা ও অধিকারের অতিরিক্ত বা বখশিস হিসেবে দেয়া হয়েছে। কাজেই এখানে এ বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর দেয়া পুরস্কার ও অনুগ্রহ সম্পর্কেই কি এ সমস্ত বাদানুবাদ, জিজ্ঞাসাবাদ ও কলহ–বিতর্ক চলছে? যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে তোমরা কবেই বা তার মালিক ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলে যে, তোমরা নিজেরাই তা বন্টন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলে? যিনি এ সম্পদ দান করেছেন

তিনিই সিদ্ধান্ত দেবেন, কাকে দেয়া হবে, কাকে দেয়া হবে না এবং যাকে দেয়া হবে কতটুকু দেয়া হবে?

যুদ্ধ প্রসংগে এটা ছিল একটা অনেক বড় ধরনের নৈতিক সংস্কার। মুসলমানের যুদ্ধ দুনিয়ার বস্তুগত স্বার্থ ও সম্পদ লাভ করার জন্য নয় বরং সত্যের নীতি অনুযায়ী দুনিয়ার নৈতিক ও তামাদ্দুনিক বিকৃতির সংস্কার সাধন করার জন্যই তা হয়ে থাকে। আর এ যুদ্ধ নীতি বাধ্য হয়ে তখনই অবলম্বন করা হয় যখন প্রতিবন্ধক শক্তিগুলো স্বাভাবিক দাওয়াত ও প্রচার পদ্ধতির মাধ্যমে সংস্কার সাধনের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দেয়। কাজেই সংস্কারকদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতে হবে উদ্দেশ্যের প্রতি। উদ্দেশ্যের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার হিসেবে যেসব সম্পদ লাভ করা হয় সেদিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকা উচিত নয়। শুরুতেই যদি এসব স্বার্থ থেকে তাদের দৃষ্টি সরিয়ে না দেয়া হয় তাহলে অতি দ্রুত তাদের মধ্যে নৈতিক অধপতন সূচিত হবে এবং তারা এসব স্বার্থ লাভকে নিজেদের উদ্দেশ্য হিসেবে গণ্য করবে।

তাছাড়া এটা যুদ্ধ প্রসংগে একটা বড় রকমের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংস্কারও ছিল। প্রাচীন যুগের পদ্ধতি ছিল, যুদ্ধে যে মালমাত্তা যার হস্তগত হতো সে-ই তার মালিক গণ্য হতো। অথবা বাদশাহ ও সেনাপতি সমস্ত গনীমাতের মালের মালিক হয়ে বসতো। প্রথম অবস্থায় দেখা যেতো, প্রায়ই বিজয়ী সেনাদলের মধ্যে গনীমাতের মাল নিয়ে প্রচণ্ড সংঘাত দেখা দিয়েছে। এমনকি অনেক সময় তাদের এ অভ্যন্তরীণ সংঘাত তাদের বিজয়কে পরাজয়ে রূপান্তরিত করে দিতো। দ্বিতীয় অবস্থায় সৈন্যরা চুরি করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়তো। তারা গনীমাতের মাল লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করতো। কুরআন গনীমাতের মালকে আল্লাহ ও রসূলের সম্পদ গণ্য করে প্রথমে এ নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, সমস্ত গনীমাতের মাল কোন রকম কমবেশী না করে পুরাপুরি ইমামের সামনে এনে রেখে দিতে হবে। তার মধ্য থেকে একটি সুঁইও লুকিয়ে রাখা যাবে না। তারপর সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে এ সম্পদ বন্টনের জন্য নিম্নোক্ত আইন প্রণয়ন করেছে ঃ এ সম্পদের পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহর কাজ ও তাঁর গরীব বান্দাদের সাহায্যের জন্য বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। আর বাকি চার ভাগ যুদ্ধে যে সেনাদল শরীক হয়েছিল তাদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দিতে হবে। এভাবে জাহেলী যুগের পদ্ধতিতে যে দু'টি ত্রুটি ছিল তা দূর হয়ে গেছে।

এখানে আরো একটি সূক্ষ্ম তত্ত্বও জেনে রাখতে হবে। গনীমাতের মাল সম্পর্কে এখানে শুধুমাত্র এতটুকু কথা বলেই শেষ করে দেয়া হয়েছে যে, "এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।" এ সম্পদ বন্টনের কোন প্রসংগ এখানে উত্থাপন করা হয়নি। এর কারণ প্রথমে স্বীকৃতি ও আনুগত্যের ভাবধারার পূর্ণতা লাভই ছিল উদ্দেশ্য। তারপর সামনের দিকে গিয়ে কয়েক রুকূ' পরে এ সম্পদ কিভাবে বন্টন করতে হবে তা বলে দেয়া হয়েছে। তাই এখানে একে "আনফাল" বলা হয়েছে এবং পঞ্চম রুকূ'তে এ সম্পদ বন্টন করার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে একে "গানায়েম" (গনীমাতের বহুবচন) বলা হয়েছে।

২. অর্থাৎ যখনই মানুষের সামনে আল্লাহর কোন হুকুম আসে এবং সে তার সত্যতা মেনে নিয়ে আনুগত্যের শির নত করে দেয় তখনই তার ঈমান বেড়ে যায়। এ ধরনের প্রত্যেকটি অবস্থায় এমনটিই হয়ে থাকে। যখনই আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের হেদায়াতের

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۪ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
لَكٰرِهُوْنَ ۝٥ يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى
الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ۝٦ وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا
لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ
اَنْ يُّحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكٰفِرِيْنَ ۝٧ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ
الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ۝٨

(এই গনীমাতের মালের ব্যাপারে ঠিক তেমনি অবস্থা দেখা দিচ্ছে যেমন অবস্থা সে সময় দেখা দিয়েছিল যখন) তোমার রব তোমাকে সত্য সহকারে ঘর থেকে বের করে এনেছিলেন এবং মুমিনদের একটি দলের কাছে এটা ছিল বড়ই অসহনীয়। তারা এ সত্যের ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়া করছিল অথচ তা একেবারে পরিষ্কার হয়ে ভেসে উঠেছিল। তাদের অবস্থা এমন ছিল, যেন তারা দেখছিল তাদেরকে মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।[৪]

স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন আল্লাহ তোমাদের সাথে ওয়াদা করছিলেন, দু'টি দলের মধ্য থেকে একটি তোমরা পেয়ে যাবে।[৫] তোমরা চাচ্ছিলে, তোমরা দুর্বল দলটি লাভ করবে।[৬] কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, নিজের বাণীসমূহের সাহায্যে তিনি সত্যকে সত্যরূপে প্রাকাশিত করে দেখিয়ে দেবেন এবং কাফেরদের শিকড় কেটে দেবেন, যাতে সত্য সত্য রূপে এবং বাতিল বাতিল হিসেবে প্রমাণিত হয়ে যায়, অপরাধীদের কাছে তা যতই অসহনীয় হোক না কেন।[৭]

মধ্যে মানুষ এমন কোন জিনিস দেখে, যা তার ইচ্ছা, আশা–আকাংখা, চিন্তা–ভাবনা, মতবাদ, পরিচিত আচার–আচরণ, স্বার্থ, আরাম–আয়েশ, ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব বিরোধী হয় এবং সে তা মেনে নিয়ে আল্লাহ ও রসূলের বিধান পরিবর্তন করার পরিবর্তে নিজেকে পরিবর্তিত করে ফেলে এবং তা গ্রহণ করতে গিয়ে কষ্ট স্বীকার করে নেয় তখন মানুষের ঈমান তরতাজা ও পরিপুষ্ট হয়। পক্ষান্তরে এমনটি করতে অস্বীকৃতি জানালে মানুষের ঈমানের প্রাণ শক্তি নিস্তেজ হয়ে যেতে থাকে। কাজেই জানা গেলো, ঈমান কোন অনড়, নিশ্চল ও স্থির জিনিসের নাম নয়। এটা শুধুমাত্র একবার মানা ও না মানার ব্যাপার নয়। একবার না মানলে শুধুমাত্র একবারই না মানা হলো এবং একবার মেনে নিলে কেবলমাত্র

একবারই মেনে নেয়া হলো এমন নয়। বরং মানা ও না মানা উভয়ের মধ্যে হ্রাস-বৃদ্ধি রয়েছে। প্রত্যেকটি অস্বীকৃতির মাত্রা কমতেও পারে, বাড়তেও পারে। আবার এমনিভাবে প্রত্যেকটি স্বীকৃতি ও মেনে নেয়ার মাত্রাও বাড়তে কমতে পারে। তবে ফিকাহর বিধানের দিক দিয়ে তামাদ্দুনিক ব্যবস্থায় অধিকার ও মর্যাদা নির্দিষ্ট করার সময় মানা ও না মানার ব্যাপারটি একবারই গণ্য করা হয়। ইসলামী সমাজে সকল স্বীকৃতি দানকারীর (মুমিন) আইনগত অধিকার ও মর্যাদা সমান। তাদের মধ্যে মানার (ঈমান) ব্যাপারে বহুতর পার্থক্য থাকতে পরে। তাতে কিছু আসে যায় না। আবার সকল অস্বীকৃতিদানকারী একই পর্যায়ের যিম্মী বা হরবী (যুদ্ধমান) অথবা চুক্তিবদ্ধ ও আশ্রিত গণ্য হয়, তাদের মধ্যে কুফরীর ব্যাপারে যতই পার্থক্য থাক না কেন।

৩. বড় বড় ও উন্নত পর্যায়ের ঈমানদাররাও ভুল করতে পারে এবং তাদের ভুল হয়েছেও। যতদিন মানুষ মানুষ হিসেবে দুনিয়ার বুকে বেঁচে আছে ততদিন তার আমলনামা শুধুমাত্র উৎকৃষ্ট মানের কার্যকলাপে ভর্তি থাকবে এবং দোষ-ত্রুটি ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকবে এমনটি হতে পারে না। কিন্তু মহান আল্লাহর একটি বড় রহমত হচ্ছে এই যে, যতদিন মানুষ বন্দেগীর অনিবার্য শর্তসমূহ পূর্ণ করে ততদিন আল্লাহ তার ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করতে থাকেন এবং তার কার্যাবলী যে ধরনের প্রতিদান লাভের যোগ্যতা সম্পন্ন হয় নিজ অনুগ্রহে তার চেয়ে কিছু বেশী প্রতিদান তাকে দান করেন। নয়তো যদি প্রত্যেকটি ভুলের শাস্তি ও প্রত্যেকটি ভাল কাজের পুরস্কার আলাদাভাবে দেবার নিয়ম করা হতো তাহলে কোন অতি বড় সৎলোকও শাস্তির হাত থেকে রেহাই পেতো না।

৪. অর্থাৎ তারা সে সময় বিপদের মোকাবিলা করতে ভয় পাচ্ছিল, অথচ বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়াই তখন ছিল সত্যের দাবী। ঠিক তেমনি গনীমাতের মাল হাতছাড়া করতে আজ তাদের কষ্ট হচ্ছে, অথচ তা পরিহার করে হুকুমের প্রতীক্ষা করাই আজ সত্যের দাবী। এর দ্বিতীয় অর্থ এ হতে পারে, যদি আল্লাহর আনুগত্য করো এবং নিজের নফসের খাহেশের পরিবর্তে রসূলের কথা মেনে নাও তাহলে ঠিক তেমনি ভাল ফল দেখতে পাবে যেমন এখনি বদর যুদ্ধের সময় দেখেছো। কুরাইশদের সেনাদলের বিরুদ্ধে লড়াই করতে যাওয়া তোমাদের কাছে বড়ই দুসহনীয় মনে হয়েছিল এবং তাকে তোমরা ধ্বংসের বার্তাবহ মনে করছিলে। কিন্তু যখন তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালন করলে তখন এ বিপজ্জনক কাজটিই তোমাদের জন্য জীবনের সাফল্যের বার্তা বহন করে আনলো।

সাধারণভাবে সীরাত ও যুদ্ধের বর্ণনা সংক্রান্ত ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বদর যুদ্ধ প্রসংগে যেসব বর্ণনা এসেছে। কুরআনের এ বক্তব্য পরোক্ষভাবে তার প্রতিবাদ করছে। অর্থাৎ এসব গ্রন্থে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুমিনদের নিয়ে প্রথমে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা লুট করার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন। তারপর কয়েক মনযিল পথ অতিক্রম করার পর যখন জানা গেলো মক্কা থেকে কুরাইশদের সেনাবাহিনী কাফেলার হেফাজত করার জন্য এগিয়ে আসছে তখন পরামর্শ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَٰٓئِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

আর সেই সময়ের কথাও স্মরণ করো যখন তোমরা তোমাদের রবের কাছে ফরিয়াদ করছিলে। জবাবে তিনি বললেন, তোমাদের সাহায্য করার জন্য আমি একের পর এক, এক হাজার ফেরেশতা পাঠাচ্ছি। একথা আল্লাহ তোমাদের শুধুমাত্র এ জন্য জানিয়ে দিলেন যাতে তোমরা সুখবর পাও এবং তোমাদের হৃদয় নিশ্চিন্ততা অনুভব করে। নয়তো সাহায্য যখনই আসে আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। অবশ্যই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

করা হলো, কাফেলার ওপর আক্রমণ করা হবে না সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করা হবে? কিন্তু কুরআন এর সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলছে। কুরআন বলছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ঘর থেকে বের হয়েছিলেন তখনই কুরাইশ সেনাদলের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধ করার বিষয়টি তাঁর সামনে ছিল। আর কাফেলা ও সেনাদল কোন্‌টিকে আক্রমণ করা হবে, এ পরামর্শও তখনি করা হয়েছিল। সেনাদলের মোকাবিলা করা অপরিহার্য, এ সত্যটি মুমিনদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেলেও তাদের মধ্য থেকে একদল লোক যুদ্ধের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বিতর্ক করে চলছিল। তারপর সবশেষে যখন সেনাদলের দিকে অগ্রসর হবার বিষয়টি চূড়ান্তভাবে স্থিরিকৃত হয়ে গেলো তখন এ দলটি মদীনা থেকে একথা মনে করেই বের হলো যে, তাদেরকে সোজা মৃত্যুর দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

৫. অর্থাৎ বাণিজ্য কাফেলা বা কুরাইশ সেনাদল।

৬. অর্থাৎ বাণিজ্য কাফেলা। তাদের সাথে মাত্র তিরিশ চল্লিশ জন রক্ষী ছিল।

৭. এ থেকে অনুমান করা যায়, সে সময় কোন্‌ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এ সূরার ভূমিকায় আমি উল্লেখ করেছি, কুরাইশ সেনাদল অগ্রসর হবার পর মূলত প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, ইসলামী দাওয়াত ও জাহেলী ব্যবস্থা এ দু'য়ের মধ্যে আরব ভূখণ্ডে কার বেঁচে থাকার অধিকার আছে? যদি মুসলমানরা সে সময় সাহসের সাথে মোকাবিলা করতে এগিয়ে না আসতো তাহলে এরপর ইসলামের জন্য আর বেঁচে থাকার কোন সুযোগ থাকতো না। পক্ষান্তরে মুসলমানদের ঘর থেকে বের হয়ে পড়ার এবং প্রথম পদক্ষেপেই কুরাইশ শক্তির ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার কারণে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যার ফলে ইসলাম মজবুতভাবে পা রাখার জায়গা পেয়ে গিয়েছিল এবং এর পরের সমস্ত মোকাবিলায় জাহেলিয়াত একের পর এক পরাজয়বরণ করেছিল।

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

আর সেই সময়, যখন আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে তন্দ্রার আকারে তোমাদের জন্য নিশ্চিন্ততা ও নির্ভীকতার পরিবেশ সৃষ্টি করছিলেন[৮] *এবং আকাশ থেকে তোমাদের ওপর পানি বর্ষণ করছিলেন, যাতে তোমাদের পাক–পবিত্র করা যায়, শয়তান তোমাদের ওপর যে নাপাকী ফেলে দিয়েছিল তা তোমাদের থেকে দূর করা যায়, তোমাদের সাহস যোগানো যায় এবং তার মাধ্যমে তোমাদেরকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।*[৯]

আর সেই সময়, যখন তোমার রব ফেরেশতাদেরকে ইঙ্গিত করছিলেন এই বলে ঃ "আমি তোমাদের সাথে আছি, তোমরা ঈমানদারদেরকে অবিচল রাখো, আমি এখনই এ কাফেরদের মনে আতংক সৃষ্টি করে দিচ্ছি। কাজেই তোমরা তাদের ঘাড়ে আঘাত করো এবং প্রতিটি জোড়ে ও গ্রন্থী–সন্ধিতে ঘা মারো।"[১০]

৮. অহোদ যুদ্ধেও মুসলমানদের এ একই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানের ১১ রুকূ'তে একথা আলোচিত হয়েছে। উভয় জায়গায় কারণ একটিই ছিল। অর্থাৎ যখনই প্রচণ্ড ভীতি ও আতংক দেখা দিয়েছে তখনই আল্লাহ মুসলমানদের দিল বিপুল নিশ্চিন্ততায় ভরে দিয়েছেন। এর ফলে তারা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

৯. যে রাতটি পোহাবার পরের দিন সকালে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, এটি ছিল সেই রাতের ঘটনা। এ বৃষ্টির সুফল ছিল তিনটি। এক, মুসলমানরা বিপুল পরিমাণ পানি পেয়ে গিয়েছিল। তারা সংগে সংগেই জলাধার তৈরী করে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল। দুই, মুসলমানরা উপত্যকার ওপরের দিকে অবস্থান করছিল। কাজেই বৃষ্টির ফলে বালি জমাট বেঁধে যথেষ্ট শক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর দিয়ে মুসলমানদের বলিষ্ঠভাবে চলাফেরা করা সহজ হয়েছিল। তিন, কাফেরদের সেনা দল ছিল নীচের দিকে। বৃষ্টির পানি সেখানে জমে গিয়ে কাদা হয়ে গিয়েছিল। ফলে সেখানে হাটতে গেলেই পা দেবে যাচ্ছিল।

মুসলমানদের মধ্যে প্রথম দিকে যে ভীতির অবস্থা বিরাজমান ছিল তাকেই শয়তানের ছুঁড়ে দেয়া নাপাকী বলা হয়েছে।

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

এটা করার কারণ, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিদ্রোহ পোষণ করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিদ্রোহ করে আল্লাহ তার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আর আল্লাহর পাকড়াও বড়ই কঠিন।[১১] —এটা[১২] হচ্ছে তোমাদের শাস্তি, এখন এর মজা উপভোগ কর। আর তোমাদের জানা উচিত, সত্য অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব।

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা একটি সেনাবাহিনীর আকারে কাফেরদের মুখোমুখি হও তখন তাদের মোকাবিলায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সে আল্লাহর গযবে ঘেরাও হয়ে যাবে। তার আবাস হবে জাহান্নাম এবং ফিরে যাবার জন্য তা বড়ই খারাপ জায়গা।[১৩] তবে হাঁ যুদ্ধের কৌশল হিসেবে এমনটি করে থাকলে অথবা অন্য কোন সেনাদলের সাথে যোগ দেবার জন্য করে থাকলে তা ভিন্ন কথা।

১০. কুরআন থেকে আমরা যে নীতিগত কথাগুলো জানতে পারি তার ভিত্তিতে আমরা মনে করি, যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফেরেশতারা হয়তো প্রত্যক্ষভাবে লড়াই করেননি এবং তরবারি হাতে নিয়ে সরাসরি মারামারি কাটাকাটিতে অংশও নেননি। সম্ভবত তারা এভাবে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল যে, কাফেরদের ওপর মুসলমানরা যে আঘাত হানছিল তা ফেরেশতাদের সহযোগিতায় সঠিক জায়গায় পড়ছিল এবং প্রতিটি আঘাত হচ্ছিল চূড়ান্ত ও মারাত্মক। অবশ্যি সঠিক ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন।

১১. এ পর্যন্ত এক এক করে বদর যুদ্ধের যে ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো, "আনফাল" শব্দের অন্তরনিহিত তত্ব উদঘাটন করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। শুরুতে বলা হয়েছিল, কেমন করে তোমরা এ গনীমাতের মালকে নিজেদের প্রচেষ্টা ও মেহনতের

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾ ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾ إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ ۚ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾

কাজেই সত্য বলতে কি, তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তোমরা নিক্ষেপ করনি বরং আল্লাহ নিক্ষেপ করেছেন।[14] (আর এ কাজে মুমিনদের হাত ব্যবহার করা হয়েছিল) এ জন্য যে, আল্লাহ মুমিনদেরকে একটি চমৎকার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সফলতার সাথে পার করে দেবেন। অবশ্যি আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। এ ব্যাপারটি তো তোমাদের সাথে। আর কাফেরদের সাথে যে আচরণ করা হবে তা হচ্ছে, আল্লাহ তাদের কৌশলগুলো দুর্বল করে দেবেন। (এ কাফেরদের বলে দাও) যদি তোমরা ফায়সালা চেয়ে থাকো, তাহলে এই নাও ফায়সালা তোমাদের সামনে এসে গেছে।[15] এখন যদি ক্ষান্ত হও, তাহলে তো তোমাদের জন্যই ভাল হবে। নয়তো যদি ফিরে আবার সেই বোকামির পুনরাবৃত্তি করো তাহলে আমিও সেই শাস্তির পুনরাবৃত্তি করবো এবং তোমাদের দলবল যত বেশীই হোক না কেন, তা তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ অবশ্যি মুমিনদের সাথে রয়েছেন।

ফল মনে করে এর মালিক বনে যেত চাচ্ছো? এতো আসলে আল্লাহর দান। দাতা নিজেই তার সম্পদের ওপর পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। এর স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে এ ঘটনাগুলো শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা নিজেরাই হিসাব লাগিয়ে দেখে নাও, এ ব্যাপারে তোমাদের নিজেদের প্রচেষ্টা, মেহনত ও সাহসিকতার অংশ কি পরিমাণ ছিল এবং আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের অংশ ছিল কি পরিমাণ?

১২. এখান থেকে হঠাৎ কাফেরদেরকে সমবোধন করা শুরু হয়েছে। যাদেরকে একটু আগে শাস্তি লাভের যোগ্য বলা হয়েছিল।

১৩. শত্রুর প্রবল চাপের মুখে নিজেদের পেছনের কেন্দ্রে ফিরে আসা অথবা নিজেদেরই সেনাদলের অন্য কোন অংশের সাথে যোগ দেবার জন্য সুপরিকল্পিত

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ ۖ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾

৩ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং হুকুম শোনার পর তা অমান্য করো না। তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যারা বললো, আমরা শুনেছি অথচ তারা শোনে না।[১৬] অবশ্যি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের জানোয়ার হচ্ছে সেই সব বধির ও বোবা লোক[১৭] যারা বিবেক–বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না। যদি আল্লাহ জানতেন, এদের মধ্যে সামান্য পরিমাণও কল্যাণ আছে তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তাদেরকে শুনতে উদ্বুদ্ধ করতেন। (কিন্তু কল্যাণ ছাড়া) যদি তিনি তাদের শুনাতেন তাহলে তারা নির্লিপ্ততার সাথে মুখ ফিরিয়ে নিতো।[১৮]

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন রসূল তোমাদের এমন জিনিসের দিকে ডাকেন যা জীবন দান করবে। আর জেনে রাখো আল্লাহ মানুষ ও তার দিলের মাঝখানে আড়াল হয়ে আছেন এবং তোমাদের তাঁর দিকেই সমবেত করা হবে।[১৯]

পশ্চাদপসরণ (Orderly Retreat) নাজায়েয নয়। তবে যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিয়ে নয় বরং নিছক কাপুরুষতা ও পরাজিত মানসিকতার কারণে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ছত্রভংগ হয়ে পালানো (Rout) হারাম। কারণ এ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য ও লক্ষের তুলনায় মানুষের প্রাণটাই তার কাছে বেশী প্রিয় হয়ে ওঠে। এ পালানোকে কবীরা গুনাহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনটি গুনাহ এমন যে, তার সাথে কোন নেকী সংযুক্ত হলে কোন লাভ নেই। এক, শিরক। দুই, বাপ–মায়ের অধিকার নষ্ট করা। তিন, আল্লাহর পথে লড়াই এর ময়দান থেকে পালানো। এভাবে তিনি আর একটি

হাদীসে এমন সাতটি বড় বড় গুনাহের কথা বর্ণনা করেছেন যা মানুষের জন্য ধ্বংসকর এবং পরকালেও তাকে ভয়াবহ পরিণামের মুখোমুখি করবে। এর মধ্যে একটি গুনাহ হচ্ছে, কুফর ও ইসলামের যুদ্ধে কাফেরদের সামনে থেকে পালানো। এটা একটা কাপুরুষোচিত কাজ বলেই যে, একে এতবড় গুনাহ গণ্য করা হয়েছে তা নয়। বরং এর কারণ হচ্ছে, একজন সৈনিকের ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি এবং ছত্রভংগ হয়ে বেরিয়ে যাওয়া অনেক সময় পুরো একটি বাহিনীকে ভীত সন্ত্রস্ত ও দিশেহারা করে দেয় এবং পালাতে উদ্বুদ্ধ করে। আর একবার যখন একটি সেনাদলের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি ও পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়, তখন তাদের বিপর্যয় ও ধ্বংস যে কতদূর গিয়ে ঠেকবে তা বলা যায় না। এ ধরনের ছুটাছুটি ও পলায়ণপরতা শুধু সেনাদলের জন্যই ধ্বংসকর নয় বরং যে দেশের সেনাদল এ ধরনের পরাজয় বরণ করে তার জন্যও বিপর্যয়কর।

১৪. বদরের যুদ্ধে যখন মুসলমান ও কাফেরদের সেনাদল ময়দানে পরস্পরের মুখোমুখি হলো এবং আঘাত-পাল্টা আঘাতের সময় এসে গেলো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মুঠো বালি হাতে নিয়ে شاهت الوجوه (শত্রুদলের চেহারাগুলো বিগড়ে যাক) বলে কাফেরদের দিকে ছুড়ে দিলেন। এই সঙ্গে তাঁর ইঙ্গিতে মুসলমানরা অকস্মাত কাফেরদের ওপর আক্রমণ করলো। এখানে এ ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৫. মক্কা থেকে রওয়ানা হবার সময় মুশরিকরা কাবা শরীফের পরদা দুহাতে আঁকড়ে ধরে দোয়া করেছিল, হে আল্লাহ! উভয় দলের মধ্যে যে দলটি ভাল তাকে বিজয় দান করো। আর আবু জেহেল বিশেষ করে বলেছিল, হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে দলটি সত্য পথে আছে তাকে বিজয় দান করো এবং যে দলটি জুলুমের পথ অবলম্বন করেছে তাকে লাঞ্ছিত করো। বস্তুত আল্লাহ তাদের নিজ মুখে উচ্চারিত আবদার অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করলেন এবং দুই দলের মধ্যে কোনটি ভাল ও সত্যপন্থী তার মীমাংসা করে দিলেন।

১৬. এখানে শোনা বলতে এমন শোনা বুঝায় যা মেনে নেয়া ও গ্রহণ করা অর্থ প্রকাশ করে। যেসব মুনাফিক ঈমানের কথা মুখে বলতো কিন্তু আল্লাহর হুকুম মেনে চলতো না এবং তার আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতো তাদের দিকেই এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৭. অর্থাৎ যারা সত্য কথা শোনেও না। সত্য কথা বলেও না। যাদের কান ও মুখ সত্যের ব্যাপারে বধির ও বোবা।

১৮. অর্থাৎ যখন তাদের মধ্যে সত্যপ্রিয়তা ও সত্যের জন্য কাজ করার আবেগ ও প্রেরণা নেই তখন তাদের যদি আদেশ পালন করার জন্য যুদ্ধে যেতে উদ্বুদ্ধ করাও হতো তাহলেও তারা এ আসন্ন বিপদ দেখেই অবলীলাক্রমে পালিয়ে যেতো। এ অবস্থায় তাদের সংগ তোমাদের জন্য কল্যাণকর হবার পরিবর্তে ক্ষতিকর প্রমাণিত হতো।

১৯. মানুষকে মুনাফেকী আচরণ থেকে বাঁচাবার জন্য সবচেয়ে প্রভাবশালী পদ্ধতি যেটি হতে পারে, তা হলো তার মনে দু'টো বিশ্বাস বদ্ধমূল করে দেয়া। এক, যাবতীয় কর্মকাণ্ড সেই আল্লাহর সাথে জড়িত যিনি মনের অবস্থাও জানেন। মানুষ তার মনে মনে যে সংকল্প পোষণ করে এবং মনের মধ্যে যেসব ইচ্ছা, আশা, আকাংখা, উদ্দেশ্য, লক্ষ ও চিন্তা-ভাবনা লুকিয়ে রাখে তার যাবতীয় গোপন তথ্য তাঁর কাছে দিনের আলোর মতো সুস্পষ্ট। দুই, একদিন আল্লাহর সামনে যেতেই হবে। তাঁর হাত থেকে বের হয়ে কেউ

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي
الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٢٦﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾
وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ
أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

আর সেই ফিত্‌না থেকে দূরে থাকো, যার অনিষ্টকারিতা শুধুমাত্র তোমাদের গোনাহগারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না।[২০] জেনে রাখো, আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তোমরা ছিলে সামান্য কয়েকজন। পৃথিবীর বুকে তোমাদের দুর্বল মনে করা হতো। লোকেরা তোমাদেরকে খতম করেই দেয় নাকি, এ ভয়ে তোমরা কাঁপতে। তারপর আল্লাহ তোমাদের আশ্রয়স্থল যোগাড় করে দিলেন, নিজের সাহায্য দিয়ে তোমাদের শক্তিশালী করলেন এবং তোমাদের ভাল ও পবিত্র জীবিকা দান করলেন, হয়তো তোমরা শোকরগুজার হবে।[২১] হে ঈমানদারগণ! জেনে বুঝে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না, নিজেদের আমানতসমূহের[২২] খেয়ানত করো না। এবং জেনে রাখো, তোমাদের অর্থ-সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি আসলে পরীক্ষার সামগ্রী।[২৩] আর আল্লাহর কাছে প্রতিদান দেবার জন্য অনেক কিছুই আছে।

কোথাও পালিয়ে বাঁচতে পারবে না। এ দু'টি বিশ্বাস যত বেশী শক্তিশালী ও পাকাপোক্ত হবে ততই মানুষ মুনাফেকী আচরণ থেকে দূরে থাকবে। এ জন্য মুনাফেকী আচরণের বিরুদ্ধে উপদেশ দান প্রসংগে কুরআন এ বিশ্বাস দু'টির উল্লেখ করেছে বারবার।

২০. এখানে 'ফিতনা' দ্বারা একটি সর্বব্যাপী সামাজিক অনাচার বুঝানো হয়েছে। এ অনাচার মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়ে মানুষের জীবনে দুর্ভাগ্য ও ধ্বংস ডেকে আনে। শুধুমাত্র যারা গোনাহ করে তারাই এ দুর্ভাগ্য ও ধ্বংসের শিকার হয় না বরং এর শিকার তারাও হয় যারা এ পাপাচারে জর্জরিত সমাজে বসবাস করা বরদাশত করে নেয়। উদাহরণস্বরূপ ধরে নেয়া যেতে পারে, যখন কোন শহরে ময়লা আবর্জনা এখানে সেখানে

ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে জমে থাকে তখন তার প্রভাবও থাকে সীমাবদ্ধ। এ অবস্থায় শুধুমাত্র যেসব লোক নিজেদের শরীরে ও ঘরোয়া পরিবেশে ময়লা আবর্জনা ভরে রেখেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু যখন সেখানে ময়লা আবর্জনার স্তূপ ব্যাপকভাবে জমে উঠতে থাকে এবং সারা শহরে ময়লা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রচেষ্টা চালাবার মতো একটি দলও থাকে না তখন মাটি, পানি ও বাতাসের সর্বত্রই বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে যে মহামারী দেখা দেয় তাতে যারা ময়লা ও আবর্জনা ছড়ায়, যারা নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন থাকে এবং যারা ময়লা ও আবর্জনাময় পরিবেশে বসবাস করে তারা সবাই আক্রান্ত হয়। নৈতিক ময়লা ও আবর্জনার বেলায়ও ঠিক একই ব্যাপার ঘটে। যদি তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু ব্যক্তির মধ্যে থেকে থাকে এবং সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজের প্রতিপত্তির চাপে কোণঠাসা ও নিস্তেজ অবস্থায় থাকে তাহলে তার ক্ষতিকর প্রভাব সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু যখন সমাজের সামষ্টিক বিবেক দুর্বল হয়ে পড়ে, নৈতিক অনিষ্টগুলোকে দমিয়ে রাখার ক্ষমতা তার থাকে না, সমাজ অংগনে অসৎ, নির্লজ্জ ও দুশ্চরিত্র লোকেরা নিজেদের ভেতরের ময়লাগুলো প্রকাশ্যে উৎক্ষিপ্ত করতে ও ছড়াতে থাকে, সৎলোকেরা নিষ্কর্মা হয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত সততা ও সদগুণাবলী নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে এবং সামাজিক ও সামষ্টিক দুষ্কৃতির ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করে তখন সামগ্রিকভাবে গোটা সমাজের ওপর দুর্ভোগ নেমে আসে। এ সময় এমন ব্যাপক দুর্যোগের সৃষ্টি হয় যার ফলে বড়–ছোট, সবল–দুর্বল সবাই সমানভাবে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়।

কাজেই আল্লাহর বক্তব্যের মর্ম হচ্ছে, রসূল যে সংস্কার ও হেদায়াতের কর্মসূচী নিয়ে মাঠে নেমেছেন এবং যে কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য তোমাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন তারিমধ্যে রয়েছে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিক দিয়ে তোমাদের জন্য যথার্থ জীবনের গ্যারান্টি। যদি সাচ্চা দিলে আন্তরিকতা সহকারে তাতে অংশ না নাও এবং সমাজের বুকে যেসব দুষ্কৃতি ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলোকে বরদাশত করতে থাকো তাহলে ব্যাপক বিপর্যয় দেখা দেবে। যদিও তোমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক থেকে থাকে যারা কার্যত দুষ্কৃতিতে লিপ্ত হয় না এবং দুষ্কৃতি ছড়াবার জন্য তাদেরকে দায়ীও করা যায় না বরং নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে তারা সুকৃতির অধিকারী হয়ে থাকে তবুও এ ব্যাপক বিপদ তোমাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে। সূরা আ'রাফের ১৬৩–১৬৬ আয়াতে শনিবারওয়ালাদের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত পেশ করতে গিয়ে এ এক কথাই বলা হয়েছে। এ দৃষ্টিভংগীকেই ইসলামের ব্যক্তি চরিত্র ও সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মৌলিক দৃষ্টিকোণ বলা যেতে পারে।

২১. এখানে শোকরগুজার শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ওপরের ধারাবাহিক বক্তব্যগুলো সামনে রাখলে একটা কথা পরিষ্কার হয়ে যায়। আল্লাহ মুসলমানদের দুর্বলতার অবস্থা থেকে বের করে এনেছেন এবং মক্কার বিপদসংকুল জীবন থেকে উদ্ধার করে তাদেরকে এমন শান্তি ও নিরাপত্তার ভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলেন যেখানে তারা উত্তম রিযিক লাভ করছে, শুধুমাত্র এতটুকু কথা মেনে নেয়াই শোকরগুজারী অর্থ প্রকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং সেই সাথে একথাও অনুধাবন করা শোকরগুজারী'র অন্তরভুক্ত যে, যে মহান আল্লাহ মুসলমানদের প্রতি এত সব অনুগ্রহ করেছেন সেই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা তাদের কর্তব্য। আর রসূল যে আন্দোলনের সূচনা করেছেন, তাকে সফল করার সাধনায়

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾ وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ۗ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٣٠﴾ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا قَالُوْا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّآ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٣١﴾

৪ রুকূ’

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করার পথ অবলম্বন করো তাহলে আল্লাহ তোমাদের কষ্টিপাথর দান করবেন[২৪] এবং তোমাদের পাপগুলো তোমাদের থেকে দূর করে দেবেন এবং তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতিশয় অনুগ্রহশীল।

সেই সময়ের কথাও স্মরণ করার মত যখন সত্য অস্বীকারকারীরা তোমার বিরুদ্ধে নানান রকমের চক্রান্ত আঁটছিল। তারা চাচ্ছিল তোমাকে বন্দী করতে। হত্যা করতে বা দেশ ছাড়া করতে।[২৫] তারা নিজেদের কূট-কৌশল প্রয়োগ করে চলছিল, অন্যদিকে আল্লাহও তাঁর কৌশল প্রয়োগ করছিলেন আর আল্লাহ সবচেয়ে ভাল কৌশল অবলম্বনকারী। যখন তাদেরকে আমার আয়াত শুনানো হতো, তারা বলতো, “হাঁ, আমরা শুনেছি, আমরা চাইলে এমন কথা আমরাও শুনাতে পারি। এতো সেই সব পুরানো কাহিনী, যা আগে থেকে লোকেরা বলে আসছে।”

তাদেরকে আন্তরিকতা ও উৎসর্গীত মনোভাব নিয়ে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এ কাজে যেসব বাধা-বিপত্তি, বিপদ-আপদ ও ক্ষয়-ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেবে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে তারা সাহসের সাথে তার মোকাবিলা করে যাবে। কারণ এ আল্লাহই ইতিপূর্বে বিপদ আপদ থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে এনেছিলেন। তারা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস রাখবে যখন তারা আন্তরিকতা সহকারে আল্লাহর কাজ করবে তখন আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের পক্ষ সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করবেন—এসবই শোকরগুজারীর অর্থের অন্তরভুক্ত। কাজেই শুধুমাত্র মুখে স্বীকৃতি দান পর্যায়ের শোকরগুজারী এখানে উদ্দেশ্য নয়। বরং এ শোকরগুজারী বাস্তবে কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। অনুগ্রহের কথা স্বীকার করা সত্ত্বেও অনুগ্রহকারীর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রচেষ্টা না চালানো, তার খিদমত করার ব্যাপারে আন্তরিক না হওয়া এবং না জানি আগামীতেও তিনি অনুগ্রহ করবেন কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা—এসব কোন ক্রমেই শোকরগুজারী নয় বরং উলটো অকৃতজ্ঞতারই আলামত।

২২. নিজেদের "আমানতসমূহ" মানে কারোর ওপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন করে যেসব দায়িত্ব তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তার আনুগত্য করা ও অংগীকার পালনের দায়িত্বও হতে পারে। অথবা কোন সামাজিক চুক্তি পালন, দলের গোপনীয়তা রক্ষা করা বা ব্যক্তিগত ও দলীয় সম্পত্তি রক্ষা করার কিংবা এমন কোন পদের অংগীকারও হতে পারে যা কোন ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে দল তার হাতে সোপর্দ করে দেয়। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আন নিসার ৮৮ টীকা)।

২৩. যে জিনিসটি সাধারণত মানুষের ঈমানী চেতনায় এবং নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করে এবং যে জন্য মানুষ প্রায়ই মুনাফেকী, বিশ্বাসঘাতকতা ও খেয়ানতে লিপ্ত হয় সেটি হচ্ছে, তার অর্থনৈতিক স্বার্থ ও সন্তান–সন্ততির স্বার্থের প্রতি সীমাতিরিক্ত আগ্রহ। এ কারণে বলা হয়েছে, এ অর্থ–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততির মোহে অন্ধ হয়ে তোমরা সাধারণত সত্য–সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাও। অথচ এগুলো তো আসলে দুনিয়ার পরীক্ষাগৃহে তোমাদের জন্য পরীক্ষার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়। যাকে তোমরা পুত্র বা কন্যা বলে জানো প্রকৃতপক্ষে সে তো পরীক্ষার একটি বিষয় (Subject)। আর যাকে তোমরা সম্পত্তি বা ব্যবসায় বলে থাকে সেও প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষার আর একটি বিষয় মাত্র। এ জিনিসগুলো তোমাদের হাতে সোপর্দ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা অধিকার ও দায়–দায়িত্বের প্রতি কতদূর লক্ষ রেখে কাজ করো, দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে আবেগ তাড়িত হয়েও কতদূর সত্য–সঠিক পথে চলা অব্যাহত রাখো এবং পার্থিব বস্তুর প্রেমাসক্ত নফসকে কতদূর নিয়ন্ত্রণে রেখে পুরোপুরি আল্লাহর বান্দায় পরিণত হও এবং আল্লাহ তাদের যতটুকু অধিকার নির্ধারণ করেছেন ততটুকু আদায়ও করতে থাকো, এগুলোর মাধ্যমে তা যাচাই করে দেখা হবে।

২৪. কষ্টিপাথর এমন একটি জিনিসকে বলা হয় যা খাঁটি ও ভেজালের মধ্যকার পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে। এটিই "ফুরকান"–এর অর্থ। এ জন্যই আমি ফুরকানের অনুবাদ করেছি কষ্টিপাথর শব্দ দিয়ে। এখানে আল্লাহর বাণীর অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা দুনিয়ায় আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহর ইচ্ছা বিরোধী কোন কাজ করতে প্রস্তুত না হয়ে থাকো, তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের মধ্যে এমন পার্থক্যকারী শক্তি সৃষ্টি করে দেবেন যার ফলে প্রতি পদে পদে তোমরা জানতে পারবে কোন্ কর্মনীতিটা ভুল ও কোন্‌টা নির্ভুল এবং কোন্ কর্মনীতি অবলম্বন করলে আল্লাহর সন্তোষ লাভ করা যায়। এবং কিসে তিনি অসন্তুষ্ট হন। জীবন পথের প্রতি বাঁকে বাঁকে, প্রতিটি চৌরাস্তায় এবং প্রতিটি চড়াই উতরাইয়ে তোমাদের অন্তরদৃষ্টি বলে দেবে কোন্ দিকে চলা উচিত এবং কোন্ দিকে চলা উচিত নয়। কোন্‌টি সেই নিরেট সত্যের পথ যা আল্লাহর দিকে নিয়ে যায় এবং কোন্‌টি মিথ্যা ও অসত্যের পথ, যা শয়তানের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দেয়।

২৫. এটা এমন সময়ের কথা যখন কুরাইশদের এ যাবতকার আশংকা নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল যে, এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মদীনায় চলে যাবেন। তখন তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, এ ব্যক্তি মক্কা থেকে বের হয়ে গেলে বিপদ আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। কাজেই তারা তাঁর ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য দারুন নদ্‌ওয়ায় জাতীয় নেতৃবৃন্দের একটি সভা ডাকলো। কিভাবে এ বিপদের পথরোধ করা যায়, এ ব্যাপারে তারা পরামর্শ করলো। এক দলের মত ছিল, এ ব্যক্তির হাতে পায়ে লোহার বেড়ী পরিয়ে এক জায়গায় বন্দী করে রাখা হোক।

وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا
حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ
وَأَنْتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ
أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا
أَوْلِيَاءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

আর সেই কথাও স্মরণযোগ্য যা তারা বলেছিল ঃ "হে আল্লাহ! যদি এটা যথার্থই সত্য হয়ে থাকে এবং তোমার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষণ করো অথবা কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব আমাদের ওপর আনো।"[২৬] তুমিই যখন তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলে তখন আল্লাহ তাদের ওপর আযাব নাযিল করতে চাচ্ছিলেন না। আর এটা আল্লাহর রীতিও নয় যে, লোকেরা ক্ষমা চাইতে থাকবে এবং তিনি তাদেরকে আযাব দেবেন।[২৭] কিন্তু এখন কেন তিনি তাদের ওপর আযাব নাযিল করবেন না যখন তারা মসজিদে হারামের পথ রোধ করছে? অথচ তারা এ মসজিদের বৈধ মুতাওয়াল্লীও নয়। এর বৈধ মুতাওয়াল্লী হতে পারে একমাত্র তাকওয়াধারীরাই। কিন্তু অধিকাংশ লোক একথা জানে না।

মৃত্যুর পূর্বে আর তাকে মুক্তি দেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ মত গৃহীত হলো না। কারণ তারা বললো, আমরা তাকে বন্দী করে রাখলেও তার যেসব সাথী কারাগারের বাইরে থাকবে তারা বরাবর নিজেদের কাজ করে যেতে থাকবে এবং সামান্য একটু শক্তি অর্জন করতে পারলেই তাঁকে মুক্ত করার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। দ্বিতীয় দলের মত ছিল, একে আমাদের এখান থেকে বের করে দাও। তারপর যখন সে আমাদের মধ্যে থাকবে না তখন সে কোথায় থাকে ও কি করে তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কি আছে? মোটকথা এভাবে তার অস্তিত্ব আমাদের জীবন ব্যবস্থায় যে বিশৃংখলা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু এ মতটিকেও এই বলে রদ করে দেয়া হলো যে, এ ব্যক্তি হচ্ছে কথার যাদুকর। কথার মাধ্যমে মানুষের মন গলিয়ে ফেলার ব্যাপারে এর জুড়ি নেই। সে এখান থেকে বের হয়ে গেলে না জানি আরবের কোন্ কোন্ উপজাতি ও গোত্রকে নিজের অনুসারী বানিয়ে নেবে! তারপর না জানি কী পরিমাণ ক্ষমতা অর্জন করে আরবের কেন্দ্রস্থলে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তোমাদের ওপর আক্রমণ করে বসবে! সব শেষে আবু জেহেল মত প্রকাশ করলো যে, আমাদের প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে উচ্চ বংশীয় অসি চালনায় পারদর্শী যুবক বাছাই করে নিতে হবে। তারা সবাই মিলে একই সংগে মুহাম্মাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং তাকে হত্যা করবে। এভাবে মুহাম্মাদকে হত্যা করার দায়টি সমস্ত গোত্রের ওপর ভাগাভাগি হয়ে যাবে। আর সবার

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا
الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ
حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ
اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ
جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٧﴾

বায়তুল্লাহর কাছে তারা কি নামায পড়ে! তারা তো শুধু সিটি দেয় ও তালি বাজায়।[২৮] কাজেই তোমরা যে সত্য অস্বীকার করে আসছিলে তার প্রতিদানে এখন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো।[২৯] যারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে তারা নিজেদের ধন–সম্পদ আল্লাহর পথ রোধ করার জন্য ব্যয় করছে এবং এখনো আরো ব্যয় করতে থাকবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ প্রচেষ্টা তাদের অনুশোচনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তারপর তারা বিজিত হবে। আর এ কাফেরদেরকে ঘেরাও করে জাহান্নামের দিকে আনা হবে। মূলত আল্লাহ কলুষতাকে পবিত্রতা থেকে ছেঁটে আলাদা করবেন এবং সকল প্রকার কলুষতা মিলিয়ে একত্র করবেন তারপর এ পুঁটলিটা জাহান্নামে ফেলে দেবেন। মূলত এরাই হবে দেউলিয়া।[৩০]

সংগে লড়াই করা বনু আব্‌দে মান্নাফের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে। কাজেই বাধ্য হয়ে তারা রক্তমূল্য গ্রহণ করতে রাজী হয়ে যাবে। এ মতটি সবাই পছন্দ করলো। হত্যা করার জন্য লোকদের নাম স্থিরীকৃত হলো। হত্যা করার সময়ও নির্ধারিত হলো। এমনকি যে রাতটি হত্যার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল সে রাতে ঠিক সময়ে হত্যাকারীরাও যথা স্থানে নিজেদের মতলব হাসিল করার উদ্দেশ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের হাত উঠাবার আগেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের চোখে ধূলো দিয়ে বের হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে একেবারে শেষ সময়ে তাদের পরিকল্পিত কৌশল বানচাল হয়ে গেলো।

২৬. একথা তারা দোয়া হিসেবে নয়, চ্যালেঞ্জের সুরে বলতো। অর্থাৎ তাদের একথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, যদি যথার্থই এটি সত্য হতো এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে হতো, তাহলে একে মিথ্যা বলার ফলে তাদের ওপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হতো এবং ভয়াবহ আযাব তাদের ওপর আপতিত হতো। কিন্তু তা হয়নি। আর যখন তা হয়নি তখন এর অর্থ হচ্ছে, এটি সত্যও নয় এবং আল্লাহর পক্ষ থেকেও আসেনি।

২৭. ওপরে তাদের যে বাহ্যিক দোয়ার উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে যে প্রশ্ন নিহিত ছিল এটি তার জওয়াব। এ জওয়াবে বলা হয়েছে, আল্লাহ মক্কী যুগে আযাব পাঠাননি কেন?

এর প্রথম কারণ ছিল, যতদিন কোন নবী কোন জনবসতিতে উপস্থিত থাকেন এবং সত্যের দাওয়াত দিতে থাকেন ততদিন পর্যন্ত জনবসতির অধিবাসীদের অবকাশ দেয়া হয় এবং পূর্বাহ্নে আযাব পাঠিয়ে তাদের সংশোধিত হবার সুযোগ কেড়ে নেয়া হয় না। এর দ্বিতীয় কারণ, যতদিন পর্যন্ত কোন জনবসতি থেকে এমন ধরনের লোকেরা একের পর এক বের-হয়ে আসতে থাকে যারা নিজেদের পূর্ববর্তী গাফলতি ও ভুল কর্মনীতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে থাকে এবং নিজেদের ভবিষ্যত কর্মনীতি ও আচার–আচরণ সংশোধন করে নেয়, ততদিন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট জনবসতিকে মহান আল্লাহ অনর্থক ধ্বংস করে দেবেন, এটা মোটেই যুক্তিসংগত নয়। তবে নবী যখন সংশ্লিষ্ট জনবসতির ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব সর্বতোভাবে পালন করার পর নিরাশ হয়ে সেখান থেকে বের হয়ে যান অথবা তাঁকে বের করে দেয়া হয় কিংবা তাঁকে হত্যা করা হয় এবং জনবসতিটি তার কার্যধারার মাধ্যমে একথা প্রমাণ করে দেয় যে, সে নিজের মধ্যে কোন সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখতে প্রস্তুত নয়, তখনই আযাবের আসল সময় এসে যায়।

২৮. আরববাসীদের মনে যে ভুল ধারণা প্রচ্ছন্ন ছিল এবং সাধারণ আরববাসীরা যার ফলে প্রতারিত হচ্ছিল এখানে সেদিকে ইশারা করা হয়েছে। তারা মনে করতো, কুরাইশরা যেহেতু বাইতুল্লাহর খাদেম ও মুতাওয়াল্লী এবং সেখানে ইবাদাত করে তাই তাদের ওপর রয়েছে আল্লাহর অনুগ্রহ। এ ধারণার প্রতিবাদ করে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র উত্তরাধিকার সূত্রে খাদেম ও মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব লাভ করলে কোন ব্যক্তি বা দল কোন ইবাদাত গৃহের বৈধ খাদেম ও মুতাওয়াল্লী হতে পারে না। একমাত্র যারা মুত্তাকী আল্লাহকে ভয় করে তারাই ইবাদাত গৃহের বৈধ মুতাওয়াল্লী হতে পারে। আর এদের অবস্থা হচ্ছে, যে গৃহটিকে শুধুমাত্র এবং নির্ভেজাল আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য নির্ধারিত করা হয়েছিল সেখানে এরা এমন এক দল লোককে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে যারা নির্ভেজাল আল্লাহর ইবাদাতকারী। এভাবে এরা মুতাওয়াল্লী ও খাদেমের দায়িত্ব পালন করার পরিবর্তে এ ইবাদাত গৃহের মালিক হয়ে বসেছে। এখন এরা যার ওপর নারায হবে তাকে এ ইবাদাত গৃহে আসতে দেবে না। এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করার ব্যাপারে এরা নিজেদেরকে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করছে। এ ধরনের পদক্ষেপ ও কার্যকলাপ এদের মুত্তাকী না হবার এবং আল্লাহকে ভয় না করার সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর এরা বাইতুল্লাহে এসে যে ইবাদাত করে তাতে না আছে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং না আছে আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠা এবং আল্লাহকে স্মরণ করার প্রবণতা। তারা একটা অর্থহীন হৈ চৈ, শোরগোল ও ক্রীড়া–কৌতুক চালিয়ে যাচ্ছে। একে এরা নাম দিয়েছে ইবাদাত। আল্লাহর গৃহের এ ধরনের নাম সর্বস্ব খিদমত এবং এ ধরনের মিথ্যা ইবাদাতের ভিত্তিতে এরা কেমন করে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের অধিকারী হয়ে গেলো। এ ধরনের কার্যকলাপ এদেরকে কেমন করে আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ রাখতে পারে?

২৯. তারা মনে করতো, শুধুমাত্র আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আকারেই আল্লাহর আযাব আসে। কিন্তু এখানে তাদের জানানো হয়েছে, বদর যুদ্ধে তাদের চূড়ান্ত পরাজয়ই আসলে তদের জন্য আল্লাহর আযাব ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের এ পরাজয় ইসলামকে জীবনী শক্তি লাভের সুসংবাদ এবং জাহেলী ব্যবস্থাকে মৃত্যুর সিদ্ধান্ত শুনিয়ে দিয়েছে।

قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ
مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ وَإِن
تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٠﴾

৫ রুকূ'

হে নবী! এ কাফেরদের বলে দাও, যদি এখনো তারা ফিরে আসে, তাহলে যা কিছু আগে হয়ে গেছে তা মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু যদি তারা আগের আচরণের পুনরাবৃত্তি করে, তাহলে অতীতের জাতিগুলোর সাথে যা কিছু ঘটে গেছে তা সবার জানা।

হে ঈমানদারগণ! এ কাফেরদের সাথে এমন যুদ্ধ করো যেন গোমরাহী ও বিশৃংখলা নির্মূল হয়ে যায় এবং দীন পুরোপুরি আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।[৩১] *তারপর যদি তারা ফিত্‌না থেকে বিরত হয় তাহলে আল্লাহই তাদের আমল দেখবেন। আর যদি তারা না মানে তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ তোমাদের পৃষ্ঠপোষক এবং তিনি সবচেয়ে ভাল সাহায্য-সহায়তা দানকারী।*

৩০. মানুষ যে পথে নিজের সমস্ত সময়, শ্রম, যোগ্যতা ও জীবন পুঁজি ব্যয় করে, তার একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়ে যদি সে জানতে পারে যে, এসব তাকে সোজা ধ্বংসের দিকে টেনে এনেছে এবং এ পথে সে যা কিছু খাটিয়েছে তাতে সূদ বা মুনাফা পাওয়ার পরিবর্তে উলটো তাকে দণ্ড ভোগ করতে হবে, তাহলে এর চাইতে বড় দেউলিয়াপনা তার জন্য আর কী হতে পারে!

৩১. ইতিপূর্বে সূরা আল বাকারার ১৯৩ আয়াতে মুসলমানদের যুদ্ধের যে একটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছিল এখানে আবার সেই একই উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যের নেতিবাচক দিক হচ্ছে, ফিত্‌নার অস্তিত্ব থাকবে না আর এর ইতিবাচক দিক হচ্ছে, দীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হয়ে যাবে। এটি একটি নৈতিক উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা মুমিনদের জন্য শুধু বৈধই নয় বরং ফরযও। এ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা জায়েয নয় এবং মুমিনদের জন্য তা শোভনীয়ও নয়। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য সূরা বাকারার ২০৪ ও ২০৫ টীকা দেখুন)।

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ۙ وَلَٰكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

আর তোমরা জেনে রাখো, তোমরা যা কিছু গনীমাতের মাল লাভ করেছো তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ, তাঁর রসূল, আত্মীয়স্বজন, এতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য নির্ধারিত।[৩২] যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো আল্লাহর প্রতি এবং ফায়সালার দিন অর্থাৎ উভয় সেনাবাহিনীর সামনা সামনি মোকাবিলার দিন আমি নিজের বান্দার ওপর যা নাযিল করেছিলাম তার প্রতি,[৩৩] (অতএব সানন্দে এ অংশ আদায় করো) আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর শক্তিশালী।

স্মরণ করো সেই সময়ের কথা যখন তোমরা উপত্যকার এদিকে ছিলে এবং তারা ছিল অন্যদিকে শিবির তৈরী করে আর কাফেলা ছিল তোমাদের থেকে নিচের (উপকূল) দিকে। যদি আগেভাগেই তোমাদের ও তাদের মধ্যে মোকাবিলার চুক্তি হয়ে থাকতো তাহলে তোমরা অবশ্যি এ সময় পাশ কাটিয়ে যেতে। কিন্তু যা কিছু সংঘটিত হয়েছে তা এ জন্য ছিল যে, আল্লাহ যে বিষয়ের ফায়সালা করে ফেলেছিলেন তা তিনি কার্যকর করবেনই। এভাবে যাকে ধ্বংস হতে হবে সে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে ধ্বংস হবে এবং যাকে জীবিত থাকতে হবে সে সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে জীবিত থাকবে।[৩৪] অবশ্যি আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও সবকিছু জানেন।[৩৫]

৩২. এ ভাষণটির শুরুতেই গনীমাতের মাল সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, তা আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার এবং তার ব্যাপারে ফায়সালা করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর

রসূলই রাখেন। এখানে এ গনীমাতের মাল বন্টনের আইন–কানুন বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে এ ফায়সালাটিও শুনিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যুদ্ধের পরে সকল সৈনিকের সব ধরনের গনীমাতের মাল এনে আমীর বা ইমামের কাছে জমা দিতে হবে। কোন একটি জিনিসও তারা লুকিয়ে রাখতে পারবে না। তারপর এ সম্পদ থেকে পাঁচ ভাগের এক ভাগ বের করে নিতে হবে। আয়াতে যে উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে এ দিয়ে তা পূর্ণ করতে হবে। বাকি চার অংশ যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে তাদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে। কাজেই এ আয়াত অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামেশা যুদ্ধের পর ঘোষণা দিতেন ঃ

ان هذه غنائمكم وانه ليس لى فيها الا نصيبى معكم الخمس والخمس مردود عليكم فادوا الخيط والمخيط واكبر من ذلك واصغر ولا تغلوا فان الغلول عار ونار –

"এ গনীমাতের সম্পদগুলো তোমাদের জন্যই। এক পঞ্চমাংশ ছাড়া এর মধ্যে আমার নিজের কোন অধিকার নেই। আর এই এক পঞ্চমাংশও তোমাদেরই সামগ্রিক কল্যাণার্থেই ব্যয়িত হয়। কাজেই একটি সুঁই ও একটি সূতা পর্যন্তও এনে রেখে দাও। কোন ছোট বা বড় জিনিস লুকিয়ে রেখো না। কারণ এমনটি করা কলংকের ব্যাপার এবং এর পরিণাম জাহান্নাম।"

এ বন্টনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অংশ একটিই। এ অংশটিকে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করা এবং সত্য দীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করাই মূল লক্ষ।

আত্মীয় স্বজন বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় তো তাঁর আত্মীয় স্বজনই বুঝাতো। কারণ তিনি নিজের সবটুকু সময় দীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করতেন। নিজের অন্ন সংস্থানের জন্য কোন কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এ কারণে তাঁর নিজের, তাঁর পরিবারের লোকদের এবং যেসব আত্মীয়ের ভরণ পোষণের দায়িত্ব তাঁর ওপর ছিল তাদের সবার প্রয়োজন পূরণ করার কোন একটা ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন ছিল। তাই 'খুমুস' তথা এক পঞ্চমাংশে তাঁর আত্মীয়দের অংশ রাখা হয়েছে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের পর 'আত্মীয়–স্বজনদের' এ অংশটি কাদেরকে দেয়া হবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এক দলের মতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে এ অংশটি বাতিল হয়ে গেছে। দ্বিতীয় দলের মতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে যে ব্যক্তি তাঁর খেলাফতের দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হবেন তার আত্মীয়–স্বজনরা এ অংশটি পাবে। তৃতীয় দলটির মতে, এ অংশটি নবীর বংশের ফকীর–মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করা হতে থাকবে। আমার নিজস্ব গবেষণা–অনুসন্ধানের ফলে যেটুকু আমি জানতে পেরেছি, তাতে দেখা যায় যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের যামানায় এ তৃতীয় মতটিই কার্যকর হতে থেকেছে।

إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۖ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ
وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٤٣﴾
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي
أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٤﴾

আর স্মরণ করো সে সময়ের কথা যখন হে নবী, আল্লাহ তোমার স্বপ্নের মধ্যে তাদেরকে সামান্য সংখ্যক দেখাচ্ছিলেন।৩৬ যদি তিনি তোমাকে তাদের সংখ্যা বেশী দেখিয়ে দিতেন তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং যুদ্ধ করার ব্যাপারে ঝগড়া শুরু করে দিতে। কিন্তু আল্লাহই তোমাদের এ থেকে রক্ষা করেছেন। অবশ্যি তিনি মনের অবস্থাও জানেন।

আর স্মরণ করো, যখন সামনাসামনি যুদ্ধের সময় আল্লাহ তোমাদের দৃষ্টিতে শত্রুদের সামান্য সংখ্যক দেখিয়েছেন এবং তাদের দৃষ্টিতেও তোমাদের কম করে দেখিয়েছেন, যাতে যে বিষয়টি অনিবার্য ছিল তাকে আল্লাহ প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিষয় আল্লাহর দিকেই ফিরে যায়।

৩৩. অর্থাৎ যে সাহায্য–সমর্থনের মাধ্যমে তোমরা বিজয় অর্জন করেছো।

৩৪. অর্থাৎ প্রমাণ হয়ে যাবে যে, যে জীবিত আছে তার জীবিত থাকাই উচিত ছিল এবং যে ধ্বংস হয়ে গেছে তার ধ্বংস হয়ে যাওয়াই সমীচীন ছিল। এখানে জীবিত থাকা ও ধ্বংস হওয়া বলতে ব্যক্তিদেরকে নয় বরং ইসলাম ও জাহেলিয়াতকে বুঝানো হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ আল্লাহ অন্ধ, বধির ও বেখবর নন। বরং তিনি জ্ঞানী—সবকিছু জানেন এবং সবকিছু দেখেন। তাঁর রাজত্বে অন্ধের মত আন্দাজে কাজ কারবার হচ্ছে না।

৩৬. এটা এমন এক সময়ের কথা যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের নিয়ে মদীনা থেকে বের হচ্ছিলেন অথবা পথে কোন মনযিলে অবস্থান করছিলেন তখন কাফেরদের যথার্থ সৈন্য সংখ্যা জানা যায়নি। এ সময় নবী (সা) স্বপ্নে কাফেরদের সেনাবাহিনী দেখলেন। তাঁর সামনে যে দৃশ্যপট পেশ করা হয় তাতে শত্রু সেনাদের সংখ্যা খুব বেশী নয় বলে তিনি অনুমান করতে পারলেন। এ স্বপ্নের বিবরণ তিনি মুসলমানদের শুনালেন। এতে মুসলমানদের হিম্মত বেড়ে গেলো এবং তারা তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখলো।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبُتُوا۟ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ وَأَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَنَٰزَعُوا۟ فَتَفْشَلُوا۟ وَتَذْهَبَ
رِيحُكُمْ ۖ وَٱصْبِرُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٤٦﴾ وَلَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ
خَرَجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ
ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧﴾ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَعْمَٰلَهُمْ
وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا
تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِىٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّىٓ
أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهَ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٤٨﴾

৬ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ। যখন কোন দলের সাথে তোমাদের মোকাবিলা হয়, তোমরা দৃঢ়পদ থাকো এবং আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকো বেশী বেশী করে। আশা করা যায়, এতে তোমরা সাফল্য অর্জন করবে। আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না, তাহলে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তির দিন শেষ হয়ে যাবে। সবরের পথ অবলম্বন করো,[৩৭] অবশ্যি আল্লাহ সবরকারীদের সাথে রয়েছেন। আর তোমরা এমন লোকদের মত আচরণ করো না, যারা অহংকার করতে করতে ও লোকদেরকে নিজেদের মাহাত্ম্য দেখাতে দেখাতে ঘর থেকে বের হয়েছে এবং যারা আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিরত রাখে।[৩৮] তারা যা কিছু করছে তা আল্লাহর নাগালের বাইরে নয়।

সেই সময়ের কথা একটু মনে করো যখন শয়তান এদের কার্যকলাপকে এদের চোখে ঔজ্জ্বল্যময় করে দেখিয়েছিল এবং এদেরকে বলেছিল, আজ তোমাদের ওপর কেউ বিজয়ী হতে পারে না এবং আমি তোমাদের সাথে আছি। কিন্তু যখন উভয় বাহিনীর সামনাসামনি মোকাবিলা শুরু হলো তখনই সে পিছনের দিকে ফিরে গেলো এবং বলতে লাগলো ঃ তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি এমন কিছু দেখছি যা তোমরা দেখো না। আমি আল্লাহকে ভয় পাচ্ছি। আল্লাহ বড় কঠোর শাস্তিদাতা।

৩৭. অর্থাৎ নিজেদের আবেগ-অনুভূতি ও কামনা-বাসনাকে সংযত রাখো। তাড়াহুড়ো করো না। ভীত-আতংকিত হওয়া, লোভ-লালসা পোষণ করা এবং অসংগত উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রকাশ থেকে দূরে থাকো। স্থির মস্তিষ্কে এবং ভারসাম্যপূর্ণ ও যথার্থ পরিমিত বিচক্ষণতা ও ফায়সালা করার শক্তি সহকারে কাজ করে যাও। বিপদ-আপদ ও সংকট-সমস্যার সম্মুখীন হলেও যেন তোমাদের পা না টলে। উত্তেজনাকর পরিস্থিতি দেখা দিলে ক্রোধ ও ক্ষোভের তরংগে ভেসে গিয়ে তোমরা যেন কোন অর্থহীন কাজ করে না বসো। বিপদের আক্রমণ চলতে থাকলে এবং অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে মোড় নিয়েছে দেখতে পেলে মানসিক অস্থিরতার কারণে তোমাদের চেতনা শক্তি বিক্ষিপ্ত ও বিশৃংখল না হয়ে পড়ে। উদ্দেশ্য সফল হবার আনন্দে অধীর হয়ে অথবা কোন আধা-পরিপক্ক ব্যবস্থাপনাকে আপাতদৃষ্টিতে কার্যকর হতে দেখে তোমাদের সংকল্প যেন তাড়াহুড়োর শিকার না হয়ে পড়ে। আর যদি কখনো বৈষয়িক স্বার্থ, লাভ ও ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্ররোচনা তোমাদের লোভাতুর করে তোলে তাহলে তাদের মোকাবিলায় তোমাদের নফ্স যেন দুর্বল হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেদিকে এগিয়ে যেতে না থাকে। এ সমস্ত অর্থ শুধু একটি মাত্র শব্দ "সবর"-এর মধ্যে নিহিত রয়েছে। আল্লাহ বলছেন, এসব দিক দিয়ে যারা সবরকারী হবে তারাই আমার সাহায্য ও সমর্থন পেয়ে ধন্য হবে।

৩৮. এখানে কুরাইশ গোত্রভুক্ত কাফেরদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাদের সেনাবাহিনী মক্কা থেকে বের হয়েছিল অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে। বাদ্য-গীত পারদর্শীনী ক্রীতদাসী পরিবেষ্টিত হয়ে তারা চলছিল। পথের মাঝখানে বিভিন্ন জায়গায় থেমে তারা নাচ-গান, শরাব পান ও আনন্দ উল্লাসের মাহফিল জমিয়ে তুলেছিল। পথে যেসব গোত্র ও জনবসতির ওপর দিয়ে তারা যাচ্ছিল তাদের ওপর নিজেদের শান শওকত, সংখ্যাধিক্য ও শক্তির দাপট এবং যুদ্ধ সরঞ্জামের ভীতি ও প্রভাব বিস্তার করে চলছিল। তারা এমনভাবে বাহাদুরী দেখাচ্ছিল যেন তাদের সামনে দাঁড়াবার মত কেউ নেই। এমনি একটা উৎকট অহংকারের ভাব তাদের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠছিল। এ ছিল তাদের নৈতিক অবস্থা। আর যে উদ্দেশ্যে তারা ঘর থেকে বের হয়েছিল তা ছিল তাদের এ নৈতিক অবস্থার চাইতেও আরো বেশী নোংরা ও অপবিত্র এবং তা তাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিল অতিরিক্ত অভিশাপের বোঝা। তারা সত্য, সততা ও ইনসাফের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার জন্য ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করতে এগিয়ে আসেনি। বরং এ ঝাণ্ডা যাতে বুলন্দ না হয় এবং যে একটি মাত্র দল সত্যের এ লক্ষে পৌছার জন্য এগিয়ে এসেছে তাকেও যাতে খতম করা যায় সেই উদ্দেশ্যেই তারা বের হয়েছিল। তারা চাইছিল দুনিয়ায় এ ঝাণ্ডা বহনকারী আর কেউ থাকবে না। এ ব্যাপারে মুসলমানদের সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা এমনটি হয়ে যেয়ো না। আল্লাহ তোমাদের ঈমান ও সত্যপ্রিয়তার যে নিয়ামত দান করেছেন তার দাবী অনুযায়ী তোমাদের চরিত্র যেমন পাক-পবিত্র হতে হবে তেমনি তোমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যও হতে হবে মহৎ।

إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٥٠﴾ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾

৭ রুকূ'

যখন মুনাফিকরা এবং যাদের দিলে রোগ আছে তারা সবাই বলছিল, এদের দীনই তো এদের মাথা বিগড়ে দিয়েছে।[৩৯] *অথচ যদি কেউ আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাহলে আল্লাহ অবশ্যি বড়ই পরাক্রান্ত ও জ্ঞানী। হায়, যদি তোমরা সেই অবস্থা দেখতে পেতে যখন ফেরেশতারা নিহত কাফেরদের রূহ কবয করছিল! তারা তাদের চেহারায় ও পিঠে আঘাত করছিল এবং বলে চলছিল "নাও এবং জ্বালাপোড়ার শাস্তি ভোগ করো। এ হচ্ছে সেই অপকর্মের প্রতিফল যা তোমরা আগেই করে রেখে এসেছো। নয়তো আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর জুলুমকারী নন।"*

এ নির্দেশ শুধুমাত্র সেই যুগের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। আজকের জন্যও এবং চিরকালের জন্য এ নির্দেশ প্রযোজ্য। সেদিন কাফেরদের সেনাবাহিনীর যে অবস্থা ছিল আজো তার মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। বেশ্যালয়, ব্যভিচারের আড্ডা ও মদের পিপা যেন অবিচ্ছেদ্য অংগের মত তাদের সাথে জড়িয়ে আছে। গোপনে নয়, প্রকাশ্যে তারা অত্যন্ত নির্লজ্জতার সাথে মেয়ে ও মদের বেশী বেশী বরাদ্দ দাবী করে। তাদের সৈন্যরা নিজেদের জাতির কাছে যৌন কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের সমাজের বেশী সংখ্যক যুবতী মেয়েদেরকে তাদের হাতে তুলে দেবার দাবী জানাতে লজ্জাবোধ করে না। এ অবস্থায় অন্য জাতিরা এদের থেকে কি আশা করতে পারে যে, এরা নিজেদের নৈতিক আবর্জনার পাঁকে তাদেরকে ডুবিয়ে দেবার ব্যাপারে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটি করবে না? আর এদের দম্ভ ও অহংকারের ব্যাপারে বলা যায়, এদের প্রত্যেকটি সৈনিক ও অফিসারের চালচলন ও কথাবার্তার ধরন থেকে তা একেবারে পরিষ্কার দেখা যেতে পারে। আর এদের প্রত্যেক জাতির নেতৃস্থানীয় পরিচালকবৃন্দের বক্তৃতাবলীতে لا غالب لكم اليوم (আজ তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারে দুনিয়াতে এমন কেউ নেই) এবং من اشد منا قوة (কে আমাদের চেয়ে শক্তিশালী?) ধরনের দম্ভোক্তিই শ্রুত হয়ে থাকে। এদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ এ নৈতিক পূতিগন্ধময় আবর্জনা থেকেও বেশী কুৎসিত ও নোংরা। এদের প্রত্যেকেই অত্যন্ত প্রতারণাপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে দুনিয়াবাসীকে একথার নিশ্চয়তা

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ
اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ
لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۙ وَأَنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ۙ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُوا بِآيَاتِ
رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٤﴾

এ ব্যাপারটি তাদের সাথে ঠিক তেমনিভাবে ঘটেছে যেমন ফেরাউনের লোকদের ও তাদের আগের অন্যান্য লোকদের সাথে ঘটে এসেছে। তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। ফলে তাদের গোনাহের ওপর আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করেছেন। আল্লাহ ক্ষমতাশালী এবং কঠোর শাস্তিদাতা। এটা ঠিক আল্লাহর এ রীতি অনুযায়ী হয়েছে, যে রীতি অনুযায়ী তিনি কোন জাতিকে কোন নিয়ামত দান করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধন করেন না যতক্ষণ না সেই জাতি নিজেই নিজের কর্মনীতির পরিবর্তন সাধন করে।[৪০] আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও সবকিছু জানেন। ফেরাউনের লোকজন ও তাদের আগের জাতিদের সাথে যা কিছু ঘটেছে এ রীতি অনুযায়ীই ঘটেছে। তারা নিজেদের রবের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। ফলে তাদের গুনাহের জন্য আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং ফেরাউনের লোক-লস্করকে ডুবিয়ে দিয়েছি। এরা সবাই ছিল জালেম।

দিয়ে যায় যে, মানবতার কল্যাণ ছাড়া তার সামনে আর কোন লক্ষ নেই। কিন্তু আসলে শুধুমাত্র মানবতার কল্যাণটাই তাদের লক্ষ্যের অন্তরভুক্ত নয়, বাকি সবকিছুই সেখানে আছে। এদের যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর এ পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতির জন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার জাতি একাই হবে তার ওপর দখলদার এবং অন্যদের তার চাকর ও কৃপাপ্রার্থী হয়ে থাকতে হবে। কাজেই এখানে ঈমানদারদেরকে কুরআন এ স্থায়ী নির্দেশ দিয়েছে যে, এ ফাসেক ও ফাজেরদের আচার আচরণ থেকেও দূরে থাকো। আবার যেসব অপবিত্র ও পূতিগন্ধময় উদ্দেশ্য নিয়ে এরা যুদ্ধে লিপ্ত হয় সেই ধরনের উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-প্রাণ উৎসর্গ করতে উদ্যোগী হয়ো না।

৩৯. অর্থাৎ মদীনার মুনাফিক গোষ্ঠী এবং বৈষয়িক স্বার্থ পূজায় ও আল্লাহর প্রতি গাফলতির রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিবর্গ যুদ্ধের সাজ সরঞ্জামহীন মুষ্টিমেয় লোকের একটি দলকে কুরাইশদের মত বিরাট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করতে দেখে নিজেদের মধ্যে এ

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٥﴾ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾

অবশ্যি আল্লাহর কাছে যমীনের ওপর বিচরণশীল জীবের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে তারাই যারা সত্যকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছে। তারপর তারা আর কোন মতেই তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। (বিশেষ করে) তাদের মধ্য থেকে এমন সব লোক যাদের সাথে তুমি চুক্তি করেছো তারপর তারা প্রত্যেকবার তা ভংগ করে এবং একটুও আল্লাহর ভয় করে না।[৪১] কাজেই এ লোকদের যদি তোমরা যুদ্ধের মধ্যে পাও তাহলে তাদের এমনভাবে মার দেবে যেন তাদের পরে অন্য যারা এমনি ধরনের আচরণ করতে চাইবে তারা দিশা হারিয়ে ফেলে।[৪২] আশা করা যায়, চুক্তি ভংগকারীদের এ পরিণাম থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে। আর যদি কখনো কোন জাতির পক্ষ থেকে তোমাদের খেয়ানতের আশংকা থাকে তাহলে তার চুক্তি প্রকাশ্যে তার সামনে ছুঁড়ে দাও।[৪৩] নিসন্দেহে আল্লাহ খেয়ানতকারীকে পছন্দ করেন না।

মর্মে বলাবলি করছিল যে, এরা আসলে নিজেদের ধর্মীয় আবেগে উন্মাদ হয়ে গেছে। এ যুদ্ধে এদের ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু এই নবী এদের কানে এমন মন্ত্র ফুঁকে দিয়েছে যার ফলে এরা বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং সামনে মৃত্যু গুহা দেখেও তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

৪০. অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জাতি নিজেকে আল্লাহর নিয়ামতের পুরোপুরি অনুপযুক্ত প্রমাণ না করে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তার কাছ থেকে নিজের নিয়ামত ছিনিয়ে নেন না।

৪১. এখানে বিশেষভাবে ইহুদীদের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। মদীনা তাইয়েবায় আসার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম তাদের সাথেই সৎ প্রতিবেশী সুলভ জীবন যাপন ও পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতার চুক্তি করেছিলেন। তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তিনি নিজের সামর্থ অনুযায়ী পূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাছাড়া ধর্মীয় দিক দিয়েও তিনি ইহুদীদেরকে মুশরিকদের তুলনায় নিজের অনেক কাছের মনে করতেন, প্রত্যেক ব্যাপারেই তিনি মুশরিকদের মোকাবিলায় আহলি কিতাবদের মত

ও পথকে অগ্রাধিকার দিতেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ভেজাল তাওহীদ ও সৎ চরিত্র নীতি সংক্রান্ত যেসব কথা প্রচার করে চলছিলেন, বিশ্বাস ও কর্মের গোমরাহীর বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করে চলছিলেন এবং সত্য দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন ইহুদীদের উলামা ও মাশায়েখ গোষ্ঠী তা একটুও পছন্দ করতো না। এ নতুন আন্দোলন যাতে কোনভাবেই সাফল্য লাভ করতে না পারে সে জন্য তারা অনবরত ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল। এ উদ্দেশ্যে তারা মদীনার মুনাফিক মুসলমানদের সাথে মিলে চক্রান্ত করে চলছিল। এ উদ্দেশ্যেই তারা আওস ও খাযরাজ বংশীয় লোকদের যেসব পুরাতন শত্রুতা ইসলাম পূর্বযুগে তাদের মধ্যে খুনাখুনি ও হানাহানির কারণ হতো সেগুলোকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করতো। এ উদ্দেশ্যেই কুরাইশ ও অন্যান্য ইসলাম বিরোধী গোত্রগুলোর সাথে তাদের গোপন যোগসাজস চলছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাদের মধ্যে যে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল তা সত্ত্বেও এসব কাজ করে চলছিল। যখন বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হলো, শুরুতে তারা আশা করেছিল, কুরাইশদের প্রথম আঘাতেই এই আন্দোলনের মৃত্যুঘন্টা বেজে উঠবে। কিন্তু ফলাফল দেখা গেলো তাদের প্রত্যাশার বিপরীত। এ অবস্থায় তাদের অন্তরে আরো বেশী করে জ্বলে উঠলো হিংসার আগুন। বদরের বিজয় যাতে ইসলামের শক্তিকে একটি স্থায়ী "বিপদে" পরিণত না করে দেয় এ আশংকায় তারা নিজেদের বিরোধিতামূলক প্রচেষ্টা আরো বেশী জোরদার করে দিল। এমনকি একজন নেতা কা'ব ইবনে আশরাফ (কুরাইশদের পরাজয়ের খবর শুনে যে ব্যক্তি চিৎকার করে বলে উঠেছিল, আজ যমীনের পেট তার পিঠের চেয়ে আমাদের জন্য অনেক ভাল) নিজে মক্কা গেলো। সেখানে সে উদ্দীপনাময় শোক গীতি গেয়ে কুরাইশদের অন্তরে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে থাকলো। এখানেই তারা ক্ষান্ত হলো না। ইহুদীদের বনী কাইনুকা গোত্র সৎ প্রতিবেশী সুলভ বসবাসের চুক্তি ভংগ করে তাদের জনবসতিতে যেসব মুসলমান মেয়ে কোন কাজে যেতো তাদেরকে উত্যক্ত ও উৎপীড়ন করতে শুরু করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের এ অন্যায় কার্যকলাপের জন্য তাদের তিরস্কার করলেন তখন তারা জবাবে হুমকি দিল ঃ "আমাদের মক্কার কুরাইশ মনে করো না। আমরা যুদ্ধ করতে ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ দিতে জানি। আমাদের মোকাবিলায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে নামলে তোমরা টের পাবে, পুরুষ কাকে বলে।"

৪২. এর অর্থ হচ্ছে, যদি কোন জাতির সাথে আমাদের চুক্তি হয়, তারপর তারা নিজেদের চুক্তির দায়িত্ব বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে আমরাও চুক্তির নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবো। এ ক্ষেত্রে আমরাও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ন্যায়সংগত অধিকার লাভ করবো। তাছাড়া যদি কোন জাতির সাথে আমাদের যুদ্ধ চলতে থাকে এবং আমরা দেখি, শত্রুপক্ষের সাথে এমন এক সম্প্রদায়ের লোকরাও যুদ্ধে শামিল হয়েছে যাদের সাথে আমাদের চুক্তি রয়েছে তাহলে আমরা তাদেরকে হত্যা করতে এবং তাদের সাথে শত্রুর মত ব্যবহার করতে একটুও দ্বিধা করবো না। কারণ তারা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের সম্প্রদায়ের চুক্তি ভংগ করে তাদের ধন-প্রাণের নিরাপত্তার প্রশ্নে তাদের সম্প্রদায়ের সাথে আমাদের যে চুক্তি রয়েছে তা লংঘন করেছে। ফলে নিজেদের নিরাপত্তার অধিকার তারা প্রমাণ করতে পারেনি।

৪৩. এ আয়াতের দৃষ্টিতে যদি কোন ব্যক্তি, দল বা দেশের সাথে আমাদের চুক্তি থাকে এবং তার কর্মনীতি আমাদের মনে তার বিরুদ্ধে চুক্তি মেনে চলার ব্যাপারে গড়িমসি করার অভিযোগ সৃষ্টি করে অথবা সুযোগ পেলেই সে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এ ধরনের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে আমাদের পক্ষে একতরফাভাবে এমন সিদ্ধান্ত করা কোনক্রমেই বৈধ নয় যে, আমাদের ও তার মধ্যে কোন চুক্তি নেই। আর এই সংগে হঠাৎ তার সাথে আমাদের এমন ব্যবহার করা উচিত নয় যা একমাত্র চুক্তি না থাকা অবস্থায় করা যেতে পারে। বরং এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হলে কোন বিরোধিতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করার আগে দ্বিতীয় পক্ষকে স্পষ্টভাষায় একথা জানিয়ে দেবার জন্য আমাদের তাগিদ দেয়া হয়েছে যে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এখন আর কোন চুক্তি নেই। এভাবে চুক্তি ভংগ করার জ্ঞান আমরা যতটুকু অর্জন করেছি তারাও ততটুকু অর্জন করতে পারবে এবং চুক্তি এখনো অপরিবর্তিত আছে, এ ধরনের ভুল ধারণা তারা পোষণ করবে না। আল্লাহর এ ফরমান অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিম্নোক্ত স্থায়ী মূলনীতি ঘোষণা করেছিলেন :

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌ فَلَا يَحُلَّنَّ عَقْدَهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ اَمَدُهَا اَوْ يَنْبِذُ اِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ -

"কোন জাতির সাথে কারোর কোন চুক্তি থাকলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার আগে তার চুক্তি লংঘন করা উচিত নয়। এক পক্ষ চুক্তি ভংগ করলে উভয় পক্ষের সমতার ভিত্তিতে অপর পক্ষ চুক্তি বাতিল করার কথা জানাতে পারে।"

তারপর এ নিয়মকে তিনি আরো একটু ব্যাপকভিত্তিক করে সমস্ত ব্যাপারে এ সাধারণ নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন : لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (যে ব্যক্তি তোমার সাথে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে খেয়ানত করো না।)। এ নীতিটি শুধুমাত্র বক্তৃতা বিবৃতিতে বলার ও বইয়ের শোভা বর্ধনের জন্য ছিল না বরং বাস্তব জীবনে একে পুরাপুরি মেনে চলা হতো। আমীর মু'আবীয়া (রা) একবার নিজের রাজত্বকালে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে সেনা সমাবেশ করতে শুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথেই অতর্কিতে রোমান এলাকায় আক্রমণ চালাবেন। তাঁর এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রসূলের (সা) সাহাবী আমর ইবনে আমবাসা (রা) কঠোর প্রতিবাদ জানান। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ হাদীসটি শুনিয়েই চুক্তির মেয়াদের মধ্যেই এ ধরনের শত্রুতামূলক কার্যকলাপকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেন। অবশেষে আমীর মু'আবীয়াকে এ নীতির সামনে মাথা নোয়াতে হয় এবং তিনি সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ বন্ধ করে দেন।

একতরফাভাবে চুক্তি ভংগ ও যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া আক্রমণ করার পদ্ধতি প্রাচীন জাহেলী যুগেও ছিল এবং বর্তমান যুগের সুসভ্য জাহেলিয়াতেও এর প্রচলন আছে। এর নতুনতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ার ওপর জার্মানীর আক্রমণ এবং ইরানের বিরুদ্ধে রাশিয়া ও বৃটেনের সামরিক কার্যক্রম। সাধারণত এ ধরনের কার্যক্রমের স্বপক্ষে এ ওযর পেশ করা হয় যে, আক্রমণের পূর্বে জানিয়ে দিলে প্রতিপক্ষ সতর্ক হয়ে

যায়। এ অবস্থায় কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয় অথবা যদি আমরা অগ্রসর হয়ে হস্তক্ষেপ না করতাম তাহলে আমাদের শত্রুরা সুবিধা লাভ করতো। কিন্তু নৈতিক দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য এ ধরনের বাহানাকে যদি যথেষ্ট মনে করা হয় তাহলে দুনিয়ায় আর এমন কোন অপরাধ থাকে না যা কোন না কোন বাহানায় করা যেতে পারে না। প্রত্যেক চোর, ডাকাত, ব্যভিচারী, ঘাতক ও জালিয়াত নিজের অপরাধের জন্য এমনি ধরনের কোন না কোন কারণ দর্শাতে পারে। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, আন্তরজাতিক পরিবেশে এরা একটি জাতির জন্য এমন অনেক কাজ বৈধ মনে করে যা জাতীয় পরিবেশে কোন ব্যক্তিবিশেষ করলে তাদের দৃষ্টিতে অবৈধ বলে গণ্য হয়।

এ প্রসংগে একথা জেনে নেয়ারও প্রয়োজন যে, ইসলামী আইন শুধুমাত্র একটি অবস্থায় পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আক্রমণ করা বৈধ গণ্য করে। সে অবস্থাটি হচ্ছে, দ্বিতীয় পক্ষ যখন ঘোষণা দিয়েই চুক্তি ভংগ করে এবং আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতামূলক কাজ করে। এহেন অবস্থায় উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের পক্ষ থেকে তার কাছে চুক্তি ভংগ করার নোটিশ দেবার প্রয়োজন হয় না। বরং আমরা অঘোষিতভাবে তার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার লাভ করি। বনী খুযাআর ব্যাপারে কুরাইশরা যখন হুদাইবিয়ার চুক্তি প্রকাশ্যে ভংগ করে তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে চুক্তি ভংগ করার নোটিশ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি এবং কোন প্রকার ঘোষণা না দিয়েই মক্কা আক্রমণ করে বসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কার্যক্রম থেকেই মুসলিম ফকীহগণ এ ব্যতিক্রমধর্মী বিধি রচনা করেছেন। কিন্তু কোন অবস্থায় যদি আমরা এ ব্যতিক্রমধর্মী নিয়ম থেকে ফায়দা উঠাতে চাই তাহলে অবশ্যি সেই সমস্ত অবস্থা আমাদের সামনে থাকতে হবে যে অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এভাবে তাঁর সমগ্র কার্যক্রমের একটি সুবিধাজনক অংশ মাত্রের অনুসরণ না করে তার সবটুকুর অনুসরণ করা হবে। হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলো থেকে যা কিছু প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ কুরাইশদের চুক্তি ভংগের ব্যাপারটি এত বেশী সুস্পষ্ট ছিল যে, তারা যে, চুক্তি ভংগ করেছে এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার কোন সুযোগ ছিল না। কুরাইশরা এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট লোকেরা নিজেরাও চুক্তি যথার্থই ভেঙে গেছে বলে স্বীকার করতো। তারা নিজেরাই চুক্তি নবায়নের জন্য আবু সুফিয়ানকে মদীনায় পাঠিয়েছিল। এর পরিষ্কার অর্থ ছিল, তাদের দৃষ্টিতেও চুক্তি অক্ষুণ্ন ছিল না। তবুও চুক্তি ভঙ্গকারী জাতি নিজেই চুক্তি ভঙ্গ করার কথা স্বীকার করবে, এটা জরুরী নয়। তবে চুক্তি ভংগ করার ব্যাপারটি একেবারে সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত হওয়া অবশ্যি জরুরী।

দুই ঃ কুরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভংগ করার পরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে বা ইশারা ইঙ্গিতে এমন কোন কথা বলেননি যা থেকে এ ইশারা পাওয়া যায় যে, এ চুক্তি ভঙ্গ করা সত্ত্বেও তিনি এখনো তাদেরকে একটি চুক্তিবদ্ধ জাতি মনে করেন এবং এখনো তাদের সাথে তাঁর চুক্তিমূলক সম্পর্ক বজায় রয়েছে বলে মনে করেন। সমস্ত বর্ণনা একযোগে একথা প্রমাণ করে যে, আবু সুফিয়ান যখন মদীনায় এসে চুক্তি নবায়নের আবেদন করে তখন তিনি তা গ্রহণ করেননি।

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٥٩﴾ وَأَعِدُّوا لَهُم
مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ
وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُوا
مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِن
جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

৮ রুকূ'

সত্য অস্বীকারকারীরা যেন এ ভুল ধারণা পোষণ না করে যে, তারা জিতে গেছে। নিশ্চয়ই তারা আমাকে হারাতে পারবে না। আর তোমরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি ও সদাপ্রস্তুত ঘোড়া তাদের মোকাবিলার জন্য যোগাড় করে রাখো।[৪৪] এর মাধ্যমে তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে, নিজের শত্রুকে এবং অন্য এমন সব শত্রুকে যাদেরকে তোমরা চিন না। কিন্তু আল্লাহ চেনেন। আল্লাহর পথে তোমরা যা কিছু খরচ করবে তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি কখনো জুলুম করা হবে না।

আর হে নবী! শত্রু যদি সন্ধি ও শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, 'তাহলে তুমিও সেদিকে ঝুঁকে পড়ো এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করো। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন।

তিন ঃ তিনি নিজে কুরাইশদের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করেন এবং প্রকাশ্যে গ্রহণ করেন। তাঁর কার্যক্রমে কোন প্রকার প্রতারণার সামান্যতম গন্ধও পাওয়া যায় না। তিনি বাহ্যত সন্ধি এবং গোপনে যুদ্ধের পথ অবলম্বন করেননি।

এটিই এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম আদর্শ। কাজেই ওপরে উল্লেখিত আয়াতের সাধারণ বিধান থেকে সরে গিয়ে যদি কোন কার্যক্রম অবলম্বন করা যেতে পারে তাহলে তা এমনি বিশেষ অবস্থায়ই করা যেতে পারে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ধরনের সরল–সহজ–ভদ্রজনোচিত পথে তা করেছিলেন তেমনি পথেই করা যেতে পারে।

তাছাড়া কোন চুক্তিবদ্ধ জাতির সাথে কোন বিষয়ে যদি আমাদের কোন বিবাদ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আমরা দেখি পারস্পরিক আলাপ আলোচনা বা আন্তর্জাতিক সালিশের মাধ্যমে এ বিবাদের মীমাংসা হচ্ছে না অথবা যদি আমরা দেখি, দ্বিতীয় পক্ষ বল প্রয়োগ

وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٤﴾

যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায় তাহলে তোমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট।[৪৫] তিনিই তো নিজের সহায়তায় ও মুমিনদের মাধ্যমে তোমাকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং মুমিনদের অন্তর পরস্পরের সাথে জুড়ে দিয়েছেন। তুমি সারা দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ ব্যয় করলেও এদের অন্তর জোড়া দিতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের অন্তর জুড়ে দিয়েছেন।[৪৬] অবশ্যি তিনি বড়ই পরাক্রমশালী ও জ্ঞানী। হে নবী! তোমার জন্য ও তোমার অনুসারী ঈমানদারদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

করে এর মীমাংসা করতে উঠে পড়ে লেগেছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য বল প্রয়োগ করে এর মীমাংসায় পৌঁছানো সম্পূর্ণরূপে বৈধ হয়ে যাবে। কিন্তু উপরোক্ত আয়াত আমাদের ওপর এ নৈতিক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের এ বল প্রয়োগ পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পর হতে হবে এবং তা হতে হবে প্রকাশ্যে। লুকিয়ে লুকিয়ে গোপনে এমন ধরনের সামরিক কার্যক্রম করা যার প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে আমরা প্রস্তুত নই, একটি অসদাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলাম এর শিক্ষা আমাদের দেয়নি।

৪৪. এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কাছে যুদ্ধোপকরণ ও একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী (Standing Army) সর্বক্ষণ তৈরী থাকতে হবে। তাহলে প্রয়োজনের সময় সংগে সংগেই সামরিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভবপর হবে। এমন যেন না হয়, বিপদ মাথার ওপর এসে পড়ার পর হতবুদ্ধি হয়ে তাড়াতাড়ি স্বেচ্ছাসেবক, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রসদপত্র যোগাড় করার চেষ্টা করা হবে এবং এভাবে প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন হতে হতেই শত্রু তার কাজ শেষ করে ফেলবে।

৪৫. অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতে তোমাদের কাপুরুষোচিত নীতি অবলম্বন করা উচিত নয়। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করে নির্ভীক ও সাহসী নীতি অবলম্বন করা উচিত। শত্রু সন্ধির কথা আলোচনা করতে চাইলে নিসংকোচে তার সাথে আলোচনার টেবিলে বসে যাবার জন্য তৈরী থাকা প্রয়োজন। সে সদুদ্দেশ্যে সন্ধি করতে চায় না বরং বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়, এ অজুহাত দেখিয়ে তার সাথে আলোচনায় বসতে অস্বীকার করো না। কারোর নিয়েত নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভবপর নয়। সে যদি সত্যিই সন্ধি

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ ٱلْـَٰٔنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّا۟ئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِا۟ئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٦٦﴾

৯ রুকূ'

হে নবী! মুমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করো। তোমাদের মধ্যে বিশজন সবরকারী থাকলে তারা দু'শ জনের ওপর বিজয়ী হবে। আর যদি এমনি ধরনের একশ জন থাকে তাহলে তারা সত্য অস্বীকারকারীদের মধ্য থেকে এক হাজার জনের ওপর বিজয়ী হবে। কারণ তারা এমন এক ধরনের লোক যাদের বোধশক্তি নেই।[৪৭]

বেশ, এখন আল্লাহ তোমাদের বোঝা হাল্কা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন যে, এখনো তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই যদি তোমাদের মধ্যে একশ জন সবরকারী হয় তাহলে তারা দু'শ জনের ওপর এবং এক হাজার লোক এমনি পর্যায়ের হলে তারা দু'হাজারের ওপর আল্লাহর হুকুমে বিজয়ী হবে।[৪৮] *আর আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।*

করার নিয়েত করে থাকে তাহলে অনর্থক তার নিয়েতের ব্যাপারে সন্ধিহান হয়ে রক্তপাতকে দীর্ঘায়িত্র করবে কেন? আর যদি বিশ্বাসঘাতকতা করার নিয়েত করে থাকে তাহলে তোমাদের আল্লাহর ওপর ভরসা করে সাহসী হওয়া দরকার। সন্ধির জন্য যে হাত এগিয়ে এসেছে তার জবাবে হাত বাড়িয়ে দাও। এর ফলে তোমাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে। আর যুদ্ধ করার জন্য যে হাত উঠবে নিজের তেজস্বী বাহু দিয়ে তাকে ভেংগে গুঁড়ো করে দাও। এভাবে সমুচিত জবাব দিতে পারলে কোন বিশ্বাসঘাতক জাতি আর তোমাদের ননীর পুতুল মনে করার দুঃসাহস দেখাবে না।

৪৬. আরববাসীদের মধ্য থেকে যারা ঈমান এনেছিলেন তাদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব, স্নেহ, প্রীতি, ভালবাসা সৃষ্টি করে মহান আল্লাহ তাদেরকে একটি শক্তিশালী দলে পরিণত করেছিলেন, এখানে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথচ এ দলের ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন গোত্র

থেকে বের হয়ে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে শত শত বছর থেকে শত্রুতা চলে আসছিল। বিশেষ করে আল্লাহর এ মেহেরবানী তো আওস ও খায্‌রাজের ব্যাপারে ছিল সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট। এ গোত্র দু'টি মাত্র দু'বছর আগেও পরস্পরের রক্তের পিয়াসী ছিল। ইতিহাসখ্যাত বুআস যুদ্ধ শেষ হয়েছিল তখনো খুব বেশী দিন হয়নি। এ যুদ্ধে আওস খায্‌রাজকে এবং খায্‌রাজ আওসকে যেন দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জন্য মরণ পণ করেছিল। এ ধরনের মারাত্মক পর্যায়ের শত্রুতাকে মাত্র দু'তিন বছরের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বে ও ভ্রাতৃত্বে পরিণত করা এবং এসব পরস্পর বিরোধী অংশগুলোকে একত্র করে এমন একটি সীসা ঢালা প্রাচীরে পরিণত করা, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের ইসলামী দলটি—নিসন্দেহে সাধারণ মানবীয় শক্তির অসাধ্য ব্যাপার ছিল। অন্যদিকে পার্থিব উপকরণাদির সাহায্যে এত বড় মহান কার্য সম্পাদন সম্ভবপর ছিল না। কাজেই মহান আল্লাহ বলেন, আমার সাহায্য ও সমর্থনের এ বিরাট সুফল যখন তোমরা লাভ করতে পেরেছো তখন আগামীতেও তোমাদের দৃষ্টি পার্থিব কার্যকারণের ওপর নয় বরং আল্লাহর সমর্থনের ওপর নিবদ্ধ হওয়া উচিত। কারণ সবকিছুর সফলতা একমাত্র তাঁর মাধ্যমেই সম্ভব।

৪৭. আধুনিক পরিভাষায় যাকে আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্মতর শক্তি, নৈতিক শক্তি বা মনোবল (Morale) বলা হয় আল্লাহ তাকেই ফিক্‌হ, বোধ, উপলব্ধি, বুদ্ধি ও ধী–শক্তি (Understanding) বলেছেন। এ অর্থ ও ভাবধারা প্রকাশের জন্য এ শব্দটি আধুনিক পরিভাষার তুলনায় বেশী বিজ্ঞানসম্মত। যে ব্যক্তি নিজের উদ্দেশ্যের ব্যাপারে সঠিকভাবে সচেতন এবং ঠাণ্ডা মাথায় ভালভাবে ভেবে চিন্তে এ জন্য সংগ্রাম করতে থাকে যে, যে জিনিসের জন্য সে নিজের প্রাণ উৎসর্গ করতে এসেছে তা তার ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান এবং তা নষ্ট হয়ে গেলে তার জন্য বেঁচে থাকা অর্থহীন হয়ে পড়বে, সে এ ধরনের চেতনা ও উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত একজন যোদ্ধার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী শক্তিশালী। যদিও শারীরিক শক্তির প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তারপর যে ব্যক্তি সত্যের জ্ঞান রাখে, যে ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব, আল্লাহর অস্তিত্ব, আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক এবং পার্থিব জীবনের তাৎপর্য, মৃত্যুর তাৎপর্য ও মৃত্যুর পরের জীবনের তাৎপর্য ভালভাবে উপলব্ধি করে এবং যে ব্যক্তি হক ও বাতিলের পার্থক্য আর এই সাথে বাতিলের বিজয়ের ফলাফল সম্পর্কেও সঠিকভাবে জ্ঞাত, তার শক্তির ধারে কাছেও এমন সব লোক পৌছতে পারবে না যারা জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতাবাদ বা শ্রেণী সংগ্রামের চেতনা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে নেমে আসে। এ জন্যই বলা হয়েছে, একজন বোধশক্তি সম্পন্ন সজাগ মুমিন ও একজন কাফেরের মধ্যে সত্যের জ্ঞান ও সত্য সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই প্রকৃতিগতভাবে এক ও দশের অনুপাত সৃষ্টি হয়। কিন্তু শুধুমাত্র উপলব্ধি ও জ্ঞানের সাহায্যে এই অনুপাত প্রতিষ্ঠিত হয় না বরং সেই সাথে সবরের গুণও এর একটি অপরিহার্য শর্ত।

৪৮. এর অর্থ এ নয় যে, প্রথমে এক ও দশের অনুপাত ছিল এবং এখন যেহেতু তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা এসে গেছে তাই এক ও দুইয়ের অনুপাত কায়েম করা হয়েছে। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, নীতিগত ও মানগতভাবে মুমিন ও কাফেরের মধ্যেতো এক ও দশেরই অনুপাত বিদ্যমান কিন্তু যেহেতু এখন তোমাদের নৈতিক প্রশিক্ষণ পূর্ণতা লাভ করেনি

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۚ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٦٨﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٩﴾

সারা দেশে শত্রুদেরকে ভালভাবে পর্যুদস্ত না করা পর্যন্ত কোন নবীর পক্ষে নিজের কাছে বন্দীদের রাখা শোভনীয় নয়। তোমরা চাও দুনিয়ার স্বার্থ। অথচ আল্লাহর সামনে রয়েছে আখেরাত। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও বিজ্ঞ। আল্লাহর লিখন যদি আগেই না লেখা হয়ে যেতো, তাহলে তোমরা যা কিছু করেছো সে জন্য তোমাদের কঠোর শাস্তি দেয়া হতো। কাজেই তোমরা যা কিছু সম্পদ লাভ করেছো তা খাও, কেননা, তা হালাল ও পাক-পবিত্র এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাকো।[৪৯] নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

এবং এখনো তোমাদের চেতনা, উপলব্ধি ও অনুধাবন ক্ষমতা পরিপক্কতা অর্জন করেনি, তাই আপাতত সর্বনিম্ন মান ধরেই তোমাদের কাছে দাবী করা হচ্ছে যে, নিজেদের চাইতে দ্বিগুণ শক্তিধরদের বিরুদ্ধে লড়তে তো তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয়। মনে রাখতে হবে, ২য় হিজরীতে এ বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। তখন মুসলমানদের মধ্যে বহু লোক সবেমাত্র নতুন নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং তাদের প্রশিক্ষণ ছিল প্রাথমিক অবস্থায়। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে যখন তারা পরিপক্কতা অর্জন করলেন তখন প্রকৃতপক্ষে তাদের ও কাফেরদের মধ্যে এক ও দশের অনুপাতই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বস্তুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলের শেষের দিকে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের বিভিন্ন যুদ্ধে বারবার এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

৪৯. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় টীকাকারগণ যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তার মোদ্দা-কথা হচ্ছে ঃ বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের যেসব লোক বন্দী হয় তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হবে এ নিয়ে পরে পরামর্শ হয়। হযরত আবু বকর (রা) পরামর্শ দেন, ফিদিয়া (মুক্তিপণ) নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়া হোক। হযরত উমর (রা) বলেন, তাদের হত্যা করা হোক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকরের (রা) মত গ্রহণ করেন এবং ফিদিয়া তথা বিনিময় মূল্য স্থিরীকৃত হয়ে যায়। এর ফলে মহান আল্লাহ তিরস্কার করে ও অসন্তোষ প্রকাশ করে এ আয়াত নাযিল করেন। কিন্তু তাফসীরকারগণ "আল্লাহর লিখন যদি আগেই লেখা না হয়ে যেতো" আয়াতের এ অংশের কোন যুক্তি সংগত ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। তারা বলেন, এখানে আল্লাহর তকদীরের কথা বলা হয়েছে অথবা আল্লাহ আগেভাগেই মুসলমানদের জন্য গনীমাতের মাল হালাল করে দেবার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট, যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়াতের বিধান প্রদানকারী

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَىٰ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٠﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

১০ রুকূ'

হে নবী! তোমাদের হাতে যেসব বন্দী আছে তাদেরকে বলো, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভাল কিছু দেখেন, তাহলে তিনি তোমাদের থেকে যা নেয়া হয়েছে তা থেকে অনেক বেশী দেবেন এবং তোমাদের ভুলগুলো মাফ করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। কিন্তু তারা যদি তোমার সাথে বিশ্বাস ভংগ করতে চায় তাহলে এর আগেও তারা আল্লাহর সাথে বিশ্বাস ভংগ করেছে, কাজেই এরি সাজা আল্লাহ তাদেরকে দিয়েছেন, যার ফলে তারা তোমার করায়ত্ব হয়েছে। আর আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং তিনি জ্ঞানী।

অহীর মাধ্যমে কোন জিনিসের অনুমতি না দেয়া হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণ করা জায়েয হতে পারে না। কাজেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ সমগ্র ইসলামী জামায়াত এ ব্যাখ্যার কারণে গুনাহগার গণ্য হবে। "খবরে ওয়াহিদ" (অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী হাদীস) এর ওপর নির্ভর করে এ ধরনের ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নেয়া বড়ই কঠিন ব্যাপার।

আমার মতে এ আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ বদরের যুদ্ধের আগে সূরা মুহাম্মাদে যুদ্ধ সম্পর্কে যে প্রাথমিক নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল ঃ

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

"কাজেই যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত থাকো তখন তাদের গর্দানে আঘাত করো। শেষে যখন তোমরা তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করবে তখন তাদের কষে বাঁধবে। তারপর হয় করুণা, নয় মুক্তিপণ। তোমরা জিহাদ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না যুদ্ধের অবসান ঘটে।"—সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৪

এ বক্তব্যে যুদ্ধবন্দীদের থেকে ফিদিয়া আদায় করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এই সংগে এ মর্মে শর্ত লাগানো হয়েছিল যে, প্রথমে শত্রুদের শক্তি ভালভাবে চূর্ণ করে দিতে হবে তারপর তাদের বন্দী করার কথা চিন্তা করতে হবে। এ ফরমান অনুযায়ী মুসলমানরা বদরে যেসব যুদ্ধ অপরাধীকে বন্দী করেছিল, তারপর তাদের কাছ থেকে যেসব

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

যারা ঈমান এনেছে, হিজরাত করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজের জানমালের ঝুঁকি নিয়ে জিহাদ করেছে আর যারা হিজরাতকারীদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, আসলে তারাই পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক। আর যারা ঈমান এনেছে ঠিকই কিন্তু হিজরাত করে (দারুল ইসলামে) আসেনি তারা হিজরাত করে না আসা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্বের ও অভিভাবকত্বের কোন সম্পর্ক নেই।[৫০] তবে হাঁ, দীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের জন্য ফরয। কিন্তু এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে।[৫১] তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখেন।

ফিদিয়া আদায় করেছিল তা অনুমতি মোতাবিক ছিল ঠিকই কিন্তু সেখানে ভুলটি ছিল এইঃ পূর্বাহ্নে "শত্রুর শক্তি ভালভাবে চূর্ণ করে দেবার" যে শর্তটি রাখা হয়েছিল তা পূর্ণ করার ব্যাপারে ত্রুটি দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধে কুরাইশ সেনারা যখন পালাতে শুরু করলো তখন মুসলমানদের অনেকেই গনীমাতের মাল লুটপাট করতে এবং কাফেরদের ধরে ধরে বাঁধতে লাগলো।। এ সময় খুব কম লোকই শত্রুদের পিছনে কিছু দূর পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। অথচ মুসলমানরা যদি পূর্ণ শক্তিতে তাদেরকে ধাওয়া করতো তাহলে সেদিনই কুরাইশদের শক্তি নির্মূল হয়ে যেতো। এ জন্য আল্লাহ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আর এ ক্ষোভ নবীর ওপর নয় বরং মুসলমানদের ওপর। আল্লাহর এ মহান ফরমানের মর্ম হচ্ছে ঃ "তোমরা এখনো নবীর মিশন ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারোনি। ফিদিয়া ও গনীমাতের মাল আদায় করে অর্থভাণ্ডার ভরে তোলা নবীর আসল কাজ নয়। একমাত্র কুফরের শক্তির দম্ভ ভেঙে গুড়িয়ে দেয়ার কাজটিই তার উদ্দেশ্য ও লক্ষের সাথে সরাসরি সম্পর্ক রাখে। কিন্তু দুনিয়ার লোভ লালসা তোমাদের ওপর বারবার প্রাধান্য বিস্তার করে। প্রথমে তোমরা চাইলে শত্রুর মূল শক্তিকে এড়িয়ে বাণিজ্য কাফেলার ওপর আক্রমণ চালাতে। তারপর চাইলে শত্রুর মাথা গুঁড়িয়ে দেবার পরিবর্তে গনীমাতের মাল লুট করতে ও যুদ্ধ অপরাধীদের বন্দী করতে। আবার এখন গনীমাতের মাল নিয়ে ঝগড়া করতে শুরু করেছো। যদি আমি আগেই ফিদিয়া আদায় করার অনুমতি না দিয়ে দিতাম তাহলে তোমাদের এ

কার্যক্রমের জন্য তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। যা হোক এখন তোমরা যা কিছু নিয়েছো তা খেয়ে ফেলো কিন্তু আগামীতে এমন ধরনের আচরণ অবলম্বন করা থেকে দূরে থাকো যা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়।" এ ব্যাখ্যার ব্যাপারে আমি মত স্থির করে ফেলেছিলাম এমন সময় ইমাম আবু বকর জাস্সাস তার আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাটিকে কমপক্ষে গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন দেখে আমি আরো একটু বেশী মানসিক নিশ্চিন্ততা অনুভব করতে পেরেছি। তারপর সীরাতে ইবনে হিশামেও একটি রেওয়ায়াত দেখেছি। তাতে বলা হয়েছে, মুসলিম মুজাহিদরা যখন গনীমাতের মাল আহরণ করতে ও কাফেরদেরকে ধরে ধরে বেঁধে ফেলতে ব্যস্ত ছিলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে মু'আযের (রা) চেহারায় কিছু বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হে সা'দ! মনে হচ্ছে লোকদের এ কাজ তোমার পছন্দ হচ্ছে না।" তিনি জবাব দিলেন, "ঠিকই, হে আল্লাহর রসূল!, মুশরিকদের সাথে এ প্রথম যুদ্ধ এবং এ যুদ্ধে আল্লাহ তাদেরকে পরাজিত করেছেন। কাজেই এ সময় বন্দী করে তাদের প্রাণ বাঁচাবার চাইতে বরং তাদেরকে চরমভাবে গুড়িয়ে দিলেই বেশী ভাল হতো। (২য় খণ্ড, ২৮০–২৮১ পৃঃ)।

৫০. এ আয়াতটি ইসলামের সাংবিধানিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। এখানে একটি মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে, "অভিভাবকত্বের" সম্পর্ক এমন সব মুসলমানদের মধ্যে স্থাপিত হবে যারা দারুল ইসলামের বাসিন্দা অথবা বাইর থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে এসেছে। আর যেসব মুসলমান ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে বাস করে তাদের সাথে অবশ্যি ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিন্তু "অভিভাবকত্বের" সম্পর্ক থাকবে না। অনুরূপভাবে যেসব মুসলমান হিজরত করে দারুল ইসলামে আসবে না বরং দারুল কুফরের প্রজা হিসেবে দারুল ইসলামে আসবে তাদের সাথেও এ সম্পর্ক থাকবে না। অভিভাবকত্ব শব্দটিকে এখানে মূলে "ওয়ালায়াত" (ولايت) শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। আরবীতে "ওয়ালায়াত" বলতে সাহায্য, সহায়তা, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতা, মৈত্রী, বন্ধুত্ব, নিকট আত্মীয়তা, অভিভাবকত্ব এবং এ সবের সাথে সামঞ্জস্যশীল অর্থ বুঝায়। এ আয়াতের পূর্বাপর আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে এ থেকে এমন ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝানো হয়েছে, যা একটি রাষ্ট্রের তার নাগরিকদের সাথে, নাগরিকদের নিজেদের রাষ্ট্রের সাথে এবং নাগিরকদের নিজেদের মধ্যে বিরাজ করে। কাজেই এ আয়াতটি "সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব"কে ইসলামী রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এ সীমানার বাইরের মুসলমানদেরকে এ বিশেষ সম্পর্কের বাইরে রাখে। এ অভিভাবকত্ব না থাকার আইনগত ফলাফল অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। উদাহরণ হিসেবে শুধুমাত্র এতটুকু ইংগিত করাই যথেষ্ট হবে যে, এ অভিভাবকত্বহীনতার ভিত্তিতে এ দারুল কুফর ও দারুল ইসলামের মুসলমানরা পরস্পরের উত্তরাধিকারী হতে পারে না এবং তারা একজন অন্যজনের আইনানুগ অভিভাবক (Guardian) হতে পারে না, পরস্পরের মধ্যে বিয়ে–শাদী করতে পারে না এবং দারুল কুফরের সাথে নাগরিকত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করেনি এমন কোন মুসলমানকে ইসলামী রাষ্ট্র নিজেদের কোন দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত করতে পারে না।[১]

১. এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন লেখকের "রাসায়েল ও মাসায়েল" ২য় খণ্ডের "দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরে মুসলমানদের মধ্যে উত্তরাধিকার ও বিয়ে–শাদীর সম্পর্ক" নিবন্ধটি।–অনুবাদক

তাছাড়া এ আয়াতটি ইসলামী রাষ্ট্রের বিদেশ নীতির ওপরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। এর দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যেসব মুসলমান অবস্থান করে তাদের দায়িত্বই ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। বাইরের মুসলমানদের কোন দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর বর্তায় না। একথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিম্নোক্ত হাদীসে বলেছেনঃ انا برى من كل مسلم بين ظهرا نى المشركين অর্থাৎ "আমার ওপর এমন কোন মুসলমানের সাহায্য সমর্থন ও হেফাজতের দায়িত্ব নেই যে মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে।" এভাবে সাধারণত যেসব বিবাদের কারণে আন্তর্জাতিক জটিলতা দেখা দেয়, ইসলামী আইন তার শিকড় কেটে দিয়েছে। কারণ যখনই কোন সরকার নিজের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে অবস্থানকারী কিছু সংখ্যালঘুর দায়িত্ব নিজের মাথায় নিয়ে নেয় তখনই এর কারণে এমন সব জটিলতা দেখা দেয় বার বার যুদ্ধের পরও যার কোন মীমাংসা হয় না।

৫১. এ আয়াতে দারুল ইসলামের বাইরে অবস্থানকারী মুসলমানদের "রাজনৈতিক অভিভাবকত্বের" সম্পর্ক মুক্ত গণ্য করা হয়েছিল। এখন এ আয়াতটি বলছে যে, তারা এ সম্পর্কের বাইরে অবস্থান করা সত্ত্বেও "ইসলামী ভ্রাতৃত্বের" সম্পর্কের বাইরে অবস্থান করছে না। যদি কোথাও তাদের ওপর জুলুম হতে থাকে এবং ইসলামী ভ্রাতৃ সমাজের সাথে সম্পর্কের কারণে তারা দারুল ইসলামের সরকারের ও তার অধিবাসীদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে নিজেদের এ মজলুম ভাইদের সাহায্য করা তাদের জন্য ফরয হয়ে যাবে। কিন্তু এরপর আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, চোখ বন্ধ করে এসব দীনী ভাইয়ের সাহায্য করা যাবে না। বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরোপিত দায়িত্ব ও নৈতিক সীমারেখার প্রতি নজর রেখেই এ দায়িত্ব পালন করা যাবে। জুলুমকারী জাতির সাথে যদি ইসলামী রাষ্ট্রের চুক্তিমূলক সম্পর্ক থাকে তাহলে এ অবস্থায় এ চুক্তির নৈতিক দায়িত্ব ক্ষুণ্ন করে মজলুম মুসলমানদের কোন সাহায্য করা যাবে না।

আয়াতে চুক্তির জন্য "মীসাক" (ميثاق) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হচ্ছে "ওসুক" (وثوق) । এর মানে আস্থা ও নির্ভরতা। এমন প্রত্যেকটি জিনিসকে "মীসাক" বলা হবে, যার ভিত্তিতে কোন জাতির সাথে আমাদের সুস্পষ্ট যুদ্ধ নয় চুক্তি না থাকলেও তারা প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন যুদ্ধ নেই এ ব্যাপারে যথার্থ আস্থাশীল হতে পারে।

তারপর আয়াতে বলা হয়েছে بينكم وبينهم ميثاق অর্থাৎ "তোমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি থাকে" এ থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার কোন অমুসলিম সরকারের সাথে যে চুক্তি স্থাপন করে তা শুধুমাত্র দু'টি সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক নয় বরং দু'টি জাতির সম্পর্কও এবং মুসলমান সরকারের সাথে সাথে মুসলিম জাতি ও তার সদস্যরাও এর নৈতিক দায়িত্বের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। মুসলিম সরকার অন্য দেশ বা জাতির সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করে ইসলামী শরীয়াত তার নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুসলিম জাতি বা তার ব্যক্তিবর্গকে মুক্ত থাকাকে আদৌ বৈধ গণ্য করে না। তবে দারুল ইসলাম সরকারের চুক্তিগুলো মেনে চলার দায়িত্ব একমাত্র তাদের ওপর বর্তাবে যারা এ রাষ্ট্রের কর্মসীমার মধ্যে অবস্থান করবে। এ সীমার বাইরে বসবাসকারী সারা দুনিয়ার মুসলমানরা কোনক্রমেই এ দায়িত্বে শামিল হবে না। এ কারণেই হোদাইবিয়ায় নবী

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٣﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ
لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

যারা সত্য অস্বীকার করেছে তারা পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা করে। যদি তোমরা এটা না করো তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা সৃষ্টি হবে ও বড় বিপর্যয় দেখা দেবে।[৫২]

যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহর পথে বাড়ি–ঘর ত্যাগ করেছে ও জিহাদ করেছে আর যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য–সহায়তা করেছে তারাই সাচ্চা মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ভুলের ক্ষমা ও সর্বোত্তম রিযিক। আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরত করে এসেছে এবং তোমাদের সাথে মিলে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাচ্ছে তারাও তোমাদেরই অন্তরভুক্ত। কিন্তু আল্লাহর কিতাবে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ পরস্পরের বেশী হকদার।[৫৩] অবশ্যি আল্লাহ সব জিনিস জানেন।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার কাফেরদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন হযরত আবু বুসাইর ও আবু জান্দাল এবং অন্যান্য মুসলমানদের ওপর তার কোন দায়িত্ব অর্পিত হয়নি, যারা মদীনার দারুল ইসলামের প্রজা ছিলেন না।

৫২. সবচেয়ে কাছের বাক্যটির সাথে যদি এ বাক্যটির সম্পর্ক মেনে নেয়া হয় তাহলে এর অর্থ হবে, যেভাবে কাফেররা পরস্পরের সাহায্য–সমর্থন করে, তোমরা ঈমানদাররা যদি সেভাবে পরস্পরের সাহায্য–সমর্থন না করো তাহলে পৃথিবীতে বিরাট ফিত্না ও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়ে যাবে। আর যদি ৭২ আয়াত থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত যতগুলো হেদায়াত দেয়া হয়েছে তার সবগুলোর সাথে যদি এর সম্পর্ক মেনে নেয়া হয় তাহলে এ উক্তির অর্থ হবে ঃ যদি দারুল ইসলামের মুসলমানরা পরস্পরের 'অলী' ও অভিভাবক না হয়, হিজরত করে যেসব মুসলমান দারুল ইসলামে আসেনি এবং যেসব মুসলমান দারুল কুফরে বসবাস করছে তাদেরকে যদি দারুল ইসলামের অধিবাসীরা নিজেদের রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব বহির্ভূত মনে না করে, যদি বাইরের মজলুম মুসলমানদের সাহায্য চাওয়ার

পর তাদের সাহায্য না করা হয়, আর যদি এ সংগে যে জাতির সাথে মুসলমানদের চুক্তি থাকে তাদের বিরুদ্ধে সাহায্যের আবেদনকারী মুসলমানদের সাহায্য না করার নীতিও না মেনে চলা হয় এবং যদি মুসলমানরা কাফেরদের সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক খতম না করে, তাহলে পৃথিবীতে বিরাট ফিতনা ও বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

৫৩. এর মানে হচ্ছে, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে তাদের পরস্পরের উত্তরাধিকার বন্টন করা হবে না। বংশধারা ও বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে যেসব অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় দীনী ভাইরা পরস্পরের ব্যাপারে সেসব অধিকারও লাভ করবে না। এসব ব্যাপারে ইসলামী সম্পর্কের পরিবর্তে আত্মীয়তার সম্পর্কই আইনগত অধিকারের ভিত্তির কাজ করবে। হিজরতের পর নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন কায়েম করেছিলেন তার ফলে এ দীনী ভাইরা পরস্পরের ওয়ারিসও হবে বলে কেউ কেউ ভাবতে শুরু করেছিলেন। তাদের এ ভাবনা যে ঠিক নয়, তা বুঝাবার জন্য আল্লাহ একথা বলেছেন।